কিশোর ক্লাসিক

সলোমনের গুপ্তধন

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.21 11:07:24 +06'00'

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ
সেবা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫
প্রজাপতি সংস্করণ
মার্চ, ১৯৯৩
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
(সেবা প্রকাশনীর একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান)
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KING SOLOMON'S MINES
By: Henry Rider Haggard
Trans: Rakib Hassan
মূল্য ॥ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র
ISBN-984-462-607-2

www.boiRboi.blogspot.com

খুলনা

এক

ভয়াবহ সেই অভিযানের কথা ভাবলে আজও আতঙ্কে হাত-পা হিম হয়ে আসে আমার। অবিশ্বাস্য সেই কাহিনীই শোনাব এখন।

জাতে আমি লেখক নই, শিকারি। ইংরেজ, বাস করি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে। নাম অ্যালান কোয়াটারমেইন। ষাট পেড়িয়েছি এই কিছুদিন আগে। জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছি আফ্রিকায়, ব্যবসা, শিকার, যুদ্ধ এবং খনিতে কাজ করে। পঁয়ষট্টিটা সিংহ মেরেছি মোটামুটি নিরাপদে। ছেষট্টি নম্বরটা মারতে গিয়েই ঘটল অঘটন। জায়গামত গুলি লাগাতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল আমার ওপর। জোর কামড় বসাল বাঁ পায়ে। হাড় ভেঙে দিল। জোড়া লেগেছে বটে, কিন্তু সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। ডাক্তার বলেছেন, জীবনের বাকি দিনগুলো এরকম খোঁড়া হয়েই থাকব।

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়লাম। হ্যাঁ, যে কাহিনী বলব বলে কলম ধরেছি। আঠারো মাস আগের ঘটনা। সে সময়ই পরিচয় হয়েছিল স্যার হেনরি কার্টিস আর ক্যাপ্টেন গুড-এর সঙ্গে।

হাতি শিকারে গিয়েছিলাম সেবার। চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে, একেবারে বামাংওয়াটো ছাড়িয়ে। কি জানি কি হয়েছিল, সবকিছুই প্রতিকূলে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জ্বরে পড়লাম। এরপর আর শিকার করা যায় না। হাতির দাঁত যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, নিয়ে ফিরে এলাম কেপ টাউনে। বেশি দর কষাকষি না করে বেচে দিলাম সব দাঁত।

দিন সাতেক কাটালাম কেপ টাউনে। একটু সুস্থ হতেই ঠিক করলাম, ডারবানে ফিরে যাব। ইংল্যাণ্ড থেকে আসবে এডিনবার্গ ক্যাসল জাহাজ। ওটা থেকে যাত্রী নিয়ে ডানকেল্ড জাহাজ যাবে ডারবানে। বন্দরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। সেদিন বিকেলে এসে পৌঁছুল জাহাজ।

যাত্রীদের মাঝে দু'জন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজনের বয়েস তিরিশ মত হবে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বিশাল বুকের ছাতি। শরীরের তুলনায় লম্বা দুই হাত। মাথায় সোনালি চুলের বোঝা, দাড়ির রঙও সোনালি। গভীর চক্ষু কোটরে বিশাল বাদামী দুই চোখ। প্যাসেঞ্জার লিস্টে চোখ বুলিয়ে জানলাম ওঁর নাম স্যার হেনরি কার্টিস। কেমন যেন চেনা চেনা লাগল ভদ্রলোককে, চেহারার সঙ্গে আমার পরিচিত কারও মিল রয়েছে। কিন্তু কার, সে মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না।

অন্য লোকটির নাম ক্যাপ্টেন জন গুড। চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়, ন্যাভাল অফিসার। মাঝারি উচ্চতা, মোটাসোটা, রোদেপোড়া বাদামী চামড়া। নিখুঁত শেভ করা চিবুকে চারিত্রিক দৃঢ়তার লক্ষণ। পোশাক-আশাকে ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন। ডান চোখে একটা আইগ্লাস। কোন সুতো বা তার দিয়ে কোথাও আটকানো নেই। দেখে মনে হয়, চোখের ওপরে গজিয়ে উঠেছে কাচটা। মোছার দরকার না হলে কাচটা চোখ থেকে সরায় না ক্যাপ্টেন। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, ঘুমানোর সময়ও কাচটা চোখেই থাকে বুঝি তার। ভুল অনুমান করেছি। ঘুমানোর সময় কাচটা খুলে যত্ন করে প্যান্টের পকেটে রেখে দেয় সে। ঝকঝকে সুন্দর দুই পাটি দাঁত দেখে হিংসেই হয়েছিল, পরে জানলাম দুপাটিই নকল। আমার পাটিজোড়াও নকল, কিন্তু ক্যাপ্টেনের মত সুন্দর না। হ্যাঁ, ঘুমানোর আগে দাঁতের পাটিজোড়াও প্যান্টের পকেটে রেখে দেয় গুড।

সারাদিনই আবহাওয়া খারাপ ছিল। সাঁঝের দিকে আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠল।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে এল তীরের দিক থেকে। ঘন কুয়াশা জমল সাগরের বুকে, একেবারে স্কটল্যাণ্ডের মত। ডেকে থাকতে পারল না যাত্রীরা।

সাগরের অবস্থা ভাল না। বড় বড় ঢেউ। ভীষণ দুলছে জাহাজ, একবার এদিকে কাত হচ্ছে, একবার ওদিক। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন, হাঁটাহাঁটি তো দূরের কথা। তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ইঞ্জিনের কাছে গরম, ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, একটু উষ্ণতার লোভে। উল্টোদিকে দেয়ালে ঝুলছে একটা দোলক। জাহাজ কোন দিকে কতখানি কাত হচ্ছে, মাপার জন্যেই ঝোলানো হয়েছে যন্ত্রটা। শঙ্কিত চোখে দেখছি ওটাকে। যেভাবে কাত হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে জাহাজ।

'গোলমাল আছে দোলকটায়,' হঠাৎ কাঁধের কাছে কথা বলে উঠল কেউ।

ফিরে চাইলাম। আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে সেই ন্যাভাল অফিসার। বললাম, 'তাই মনে হচ্ছে?'

'মনে হওয়ার কিছু নেই। বুঝেই বলছি,' আরেকবার কাত হল জাহাজ। 'সোজা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল ক্যাপ্টেন। তারপর বলল, 'যন্ত্রের মাপ ঠিক হলে বহু আগেই উল্টে যেত জাহাজ। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে কর্মকর্তাদের মনোযোগের অভাব আছে।'

এই সময় রাতের খাবার ঘন্টা বাজল। আমি আর ক্যাপ্টেন চললাম খাবার ঘরে। আমাদের আগেই হাজির হয়েছেন হেনরি কার্টিস। গুড গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল। আমি বসলাম ওদের উল্টোদিকে। খেতে খেতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ চলল আমার। হাতি শিকারের কথা উঠল একসময়।

'ভাল লোককেই ধরেছেন,' পাশ থেকে বলে উঠল আমার পরিচিত এক লোক। 'হাতি শিকারের গল্প কোয়াটারমেইনের চেয়ে ভাল আর কেউ বলতে পারবে না।'

নীরবে আমাদের আলাপ শুনছিলেন এতক্ষণ স্যার হেনরি। চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। 'কোয়াটারমেইন! কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনি কি অ্যালান কোয়াটারমেইন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না স্যার হেনরি। আপন মনেই বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। দাড়িগোঁফের আড়াল থেকে মাত্র দুটো শব্দ উদ্ধার করতে পারল আমার কান, 'কপাল ভালই।'

খাওয়া শেষ হল। স্যালুন থেকে বেরিয়ে যাব। তাঁর কেবিনে গিয়ে একটু বসার অনুরোধ জানালেন স্যার হেনরি।

অরাজি হবার কোন কারণ নেই। গেলাম। ক্যাপ্টেন গুডও গেল আমাদের সঙ্গে। জাহাজের সবচেয়ে ভাল কেবিন ওটা। আমাকে সোফায় বসতে বললেন স্যার হেনরি। ক্যাপ্টেন বসল একটা চেয়ারে। বোতল আর গেলাস বের করে মদ ঢাললেন স্যার হেনরি। একটা গেলাস বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি। 'গত বছর এমনি দিনে বামাংওয়াটোতে ছিলেন আপনি, না? ট্রান্সভালের উত্তরে?'

'হ্যাঁ,' একটু অবাকই হলাম। ভদ্রলোক আমার গতিবিধির সব খবরই রাখেন দেখছি! কৌতূহলও জাগল খানিকটা। আমার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন হেনরি কার্টিস?

'ওখানে ব্যবসা করছিলেন আপনি, না?' ফস করে বলে বসল ক্যাপ্টেন গুড।

'হ্যাঁ। এক গাড়ি মাল নিয়ে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প ফেলেছিলাম একটা বসতির ধারে। সব মাল বিক্রি শেষ না করে সরিনি ওখান থেকে।'

সামনের টেবিলে দু'হাত ছড়িয়ে চেয়ারে ঝুঁকে বসেছেন স্যার হেনরি। চেয়ে আছেন আমার দিকে। বিশাল দুই বাদামী চোখে কৌতূহল আর উদ্বেগ। 'আচ্ছা, নেভিলি নামে

www.boiRboi.blogspot.com

কারও সঙ্গে ওখানে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। আমার ক্যাম্পের কাছেই ক্যাম্প ফেলেছিল। বিশ্রাম দিয়েছিল বলদগুলোকে। দিন পনেরো পরে ক্যাম্প তুলে রওনা হয়ে যায় সে। ঢুকে যায় দেশের আরও ভেতরে। হ্যাঁ, মাস কয়েক আগে এক উকিলের চিঠি আসে আমার কাছে। নেভিলির খোঁজখবর জানতে চায় উকিল। সাধ্যমত খোঁজ নিয়ে জবাব দিয়েছি চিঠির।'

'আপনার সে চিঠি উকিলের হাত থেকে আমার হাতে পৌঁছেছে,' বললেন স্যার হেনরি। 'আপনি লিখেছেনঃ মে মাসের শুরুতে বামাংওয়াটো ত্যাগ করে নেভিলি। বলদে টানা একটা গাড়ি নিয়েছিল, সঙ্গী ছিল দুজন লোক। একজন গাড়ির চালক। অন্যজন পথ-প্রদর্শক এবং শিকারি এক নিগ্রো, নাম জিম। নেভিলির ইচ্ছে ছিল, ম্যাটাবেল প্রদেশের শেষ ব্যবসাকেন্দ্র ইনাইয়াটি পৌঁছুবে। ওখানে মালসহ গাড়ি বলদ সবে বেচে দিয়ে এগিয়ে যাবে পায়ে হেঁটে, দেশের আরও গভীরে। লিখেছেনঃ মাস ছয়েক আগে নেভিলির সেই গাড়িটা এক পর্তুগিজ ব্যবসায়ীর দখলে দেখেছেন। ব্যবসায়ী আপনাকে জানিয়েছে, গাড়িটা ইনাইয়াটিতে এক শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে কিনেছে সে। সঙ্গে একজন চাকর নিয়ে শিকার করতে দেশের আরও ভেতরে ঢুকে গেছে শ্বেতাঙ্গ। তবে লোকটির নাম মনে করতে পারছে না ব্যবসায়ী।' থামলেন স্যার হেনরি।

'হ্যাঁ,' বললাম।

খানিকক্ষণ নীরবতা।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' হঠাৎ বললেন স্যার হেনরি, 'মিস্টার নেভিলি কোথায় গেছে জানেন? উত্তরে ঠিক কোন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার, অনুমান করতে পেরেছেন কি?'

'কিছু কিছু কথা কানে এসেছে আমার,' থেমে গেলাম। বলা উচিত হবে? পরস্পরের দিকে তাকালেন স্যার হেনরি আর ক্যাপ্টেন। মাথা ঝাঁকাল গুড।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি। 'একটা গল্প শোনাচ্ছি আপনাকে। এরপরে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাইব, হয়ত সহযোগিতাও। শুনেছি, নাটালে আপনি খুব সম্মানিত মানুষ। কিছু কিছু ব্যাপারে আপনার পরামর্শ ধ্রুববাক্য হিসেবে মেনে নেয়া যায়।'

'বাড়িয়ে বলা লোকের অভ্যাস,' বিনীত হাসি হাসলাম। অপ্রতিভ ভাবটা লুকাতে চুমুক দিলাম মদের গেলাসে।

'নেভিলি আমার ভাই,' বলে ফেললেন স্যার হেনরি।

'তাই!' তীক্ষ্ণ চোখে চাইলাম হেনরির দিকে। চেহারা-সুরতে দুই ভাইয়ের মিল খুব বেশি না। আকারে স্যার হেনরির চেয়ে অনেক ছোট নেভিলি, চুলদাড়িও সোনালি না, কালো। কিন্তু ধূসর চোখ আর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা একেবারে এক। এই চোখের জন্যেই তাঁকে চেনা চেনা লাগছিল, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

'ও ছিল,' বলে গেলেন স্যার হেনরি, 'আমার ছোট এবং একমাত্র ভাই। পাঁচ বছর আগেও একে অন্যকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারতাম না। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরেই পড়ল অঘটন, সংসারে সচরাচর যা ঘটে থাকে। ঝগড়া করলাম দুজনে। রাগের মাথায় খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম ওর সঙ্গে।'

সংসারের এই গোলমালের প্রতি বিরাগ দেখাতেই যেন জোরে জোরে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন গুড। ঠিক এই সময় জোরে এক দোল দিয়ে গড়িয়ে অনেকখানি কাত হয়ে গেল জাহাজ। আমাদের দিক থেকে ছাতের দিকে ফিরল গুডের কাচ, ছাতের দিক থেকে আবার ফিরল আমাদের দিকে। আবার সোজা হয়েছে জাহাজ।

'আপনি জানেন,' আমার দিকে চেয়ে বললেন স্যার হেনরি, 'ইংল্যাণ্ডে উইল করে ভাগাভাগি করে না দিয়ে গেলে বাপের জায়গা-জমির মালিক হয় তার বড় ছেলে।

আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এই জায়গাজমি নিয়েই ঝগড়া বাধাই দু'ভাইয়ে। এসব কথা এখন বলতেও লজ্জা লাগছে, কিন্তু আপনাকে খোলাখুলি জানাচ্ছি সব।'

'বলে যাও, বলে যাও,' বলল ক্যাপ্টেন। 'এসব কথা, মিস্টার কোয়াটারমেইন বলবেন না কাউকে।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'না কি বলেন?'

'নিশ্চয়।' জোর গলায় বললাম। আমার ওপর দুজনের আস্থা আছে জেনে গর্বই লাগছে।

'ওই সময়,' আবার বললেন স্যার হেনরি, 'আমার ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে কয়েকশো পাউণ্ড জমা ছিল। ঝগড়ার পর পরই সব টাকা একবারে তুলে নিল সে। নাম পাল্টে নাম রাখল নেভিলি। সৌভাগ্যের খোঁজে পাড়ি জমাল একদিন দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে জেনেছি আমি এসব কথা। তিন বছর পেরিয়ে গেল। ঠিকানা জোগাড় করে এর মাঝে অনেকবার চিঠি লিখেছি আমি। কোন জবাব এল না ভাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু আমি জানি, আমার সব চিঠিই তার হাতে পৌঁছেছে। দিনকে দিন মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। অনুশোচনায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলাম।'

'রক্তের টান,' বললাম। মনে পড়ে গেল আমার ছেলে হ্যারির কথা।

'জর্জ ছাড়া দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই। ওকে দেখতে চাই। শুধু বাপের সম্পত্তিই না, আমার কামাইয়ের অর্ধেকও ভাইকে দিয়ে দিতে রাজি এখন আমি।'

'আগে বাপের জমির অর্ধেক দিয়ে দিলেই চলত,' নিরস গলায় বলল ক্যাপ্টেন। আইগ্লাসটা স্থির চেয়ে আছে হেনরি কার্টিসের দিকে।

ক্যাপ্টেনের কথায় কান না দিয়ে বললেন স্যার হেনরি, 'মিস্টার কোয়াটারমেইন, দিন যত গেল, আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি। তখন ভাইয়ের আর কোন খোঁজই পাচ্ছি না। ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, জানি না। অনেককে দিয়ে অনেক খোঁজখবর করালাম, কিন্তু বৃথা। শেষে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম একদিন। জর্জকে খুঁজে বের করবই, ফিরিয়ে নিয়ে আসব বাড়িতে। কথাটা জানালাম ক্যাপ্টেনকে। ও-ও আমার সঙ্গী হতে চাইল। খুশি মনেই সঙ্গে নিলাম ওকে।'

'ও খুশি না হলেও সঙ্গে আসতাম আমি,' বলল কাপ্টেন। 'এছাড়া আর কিছু করারও নেই আমার। বেতনের অর্ধেক পেনশন ধরিয়ে দিয়ে অ্যাডমিরালটির কর্তারা পথে বের করে দিয়েছে আমাকে, না খেয়ে মরার জন্যে।...ওসব কথা থাক এখন। মিস্টার কোয়াটারমেইন, এবার বলুন, নেভিলির ব্যাপারে আর কি কি জানেন আপনি। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।'

দুই

বলব কি বলব না ভাবছি। পাইপে তামাক ভরার ছুতোয় খানিকটা সময় নিলাম।

'ঠিক কোথায় যাবার জন্যে বেরিয়েছিল আমার ভাই,' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন স্যার হেনরি, 'শুনেছেন কিছু?'

'শুনেছি,' আর দ্বিধা করলাম না। 'শুনেছি সলোমনের গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়েছিল সে।'

'সলোমনস মাইনস!' একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি আর ক্যাপ্টেন গুড। 'কোথায় ওটা?'

'জানি না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লাম। 'তবে শোনা যায়, কয়েকটা বিশেষ পাহাড়ের ওপারে জায়গাটা। ওই পাহাড়গুলোর চূড়া দেখেছি আমি দূর থেকে। আমার আর পাহাড়গুলোর মাঝে তখন একশো তিরিশ মাইল মরুভূমি। শুনেছি, একজন ছাড়া

www.boiRboi.blogspot.com

আর কোন শ্বেতাঙ্গ ওই মরুভূমি পেরোতে পারেনি। সলোমনস মাইনস সম্পর্কে আরও কিছু কথা কানে এসেছে আমার। শোনাতে পারি, তবে কথা দিতে হবে আর কারও কাছে বলবেন না এসব কথা। তাহলে আমাকে পাগল ভাববে লোকে।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন স্যার হেনরি।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'বলব না। কথা দিলাম।'

'বেশ,' বলে গেলাম আমি। 'অনেকেরই ধারণা, হাতি শিকারিরা একেবারে নীরস, শিকারের বাইরে আর কিচ্ছু বোঝে না। ভুল। ইতিহাস, এমন কি সাহিত্যপাগল অনেকে পেশাদার শিকারির দেখাও আমি পেয়েছি। বছর তিরিশেক আগে এমনি এক শিকারির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার নাম ইভান্স। সেবার, ম্যাটাবেলে প্রথম হাতি শিকার করতে গেছি। ফেরার পথে দেখা হয় ওর সঙ্গে। ওই একবারই। এরপর আর কখনও দেখিনি তাকে, দেখবও না কোনদিন। শুনেছি, বুনো মোষ মেরে ফেলেছে। তাকে কবর দেয়া হয়েছে জাম্বেজী জলপ্রপাতের কাছে।' একটু থেমে আবার বললাম, 'এক রাতে, তাঁবুর বাইরে আগুনের পাশে বসে আলাপ করছি দুজনে। কথায় কথায় আমার দেখা এক অদ্ভুত জায়গার কথা বললাম তাকে। তখন ট্রান্সভালের লিডেনবার্গ জেলায় কুদু আর এলাণ্ড হরিণ শিকার করছি আমি। শিকার খুঁজতে খুঁজতে একদিন এক দুর্গম এলাকায় একটা পথের ওপর এসে পড়লাম। চওড়া পথ, পাথর কেটে বানানো হয়েছে গরুর গাড়ি চলাচলের জন্যে। ক্ষয়ে-ধসে গেছে এখন সে-পথ। অনেক অনেক দিন আগে বানানো হয়েছিল নিশ্চয়! কৌতূহল হল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম পথ ধরে। একটা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুলাম। বিশাল এক গুহামুখের ভেতরে ঢুকে গেছে পথটা। ঢুকে গেলাম ভেতরে। তাজ্জব কাণ্ড! বিশাল এক গ্যালারির মত রয়েছে ভেতরে। সোনা মেশানো কোয়ার্জ পাথরে বোঝাই করে রাখা হয়েছে পাথরের তাকগুলো। দেখে মনে হয়, খনি থেকে ওই পাথর তুলে গ্যালারিতে সাজিয়ে রেখেছে শ্রমিকেরা। তারপর হঠাৎ কোন কারণে তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে, পাথরগুলো নিয়ে যাবার সময়ও পায়নি। পাহাড়ের বাইরে বিশাল এক প্রাসাদের গাঁথনিও দেখতে পেয়েছি।

এ আর কি অদ্ভুত! আমার কাহিনী শুনে বলল ইভান্স। আরও আশ্চর্য জিনিস দেখেছি আমি। এক আজব কাহিনী বলে গেল সে। কালো আফ্রিকার অভ্যন্ত কিভাবে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখে এসেছে, খুলে বলল সব ওই নগরীই বাইবেলে বর্ণিত অফির নগরীর ধ্বংসস্তূপ। এরপর বলে গে আর ফিনিশিয়ান অভিযাত্রীদের অভিযান কাহিনী, কালো রাজ্যের ইতিহাস। মুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে শুনছি, হঠাৎ তার এক প্রশ্নে চ অতীত থেকে, মাশুকুলামবু প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে সুলিমান পর্বতমাল

'এপাশ ওপাশ মাথা দোলালাম। শুনিনি।

'ইভান্স বলল, ওখানেই আছে রাজা সলোমনের হীরক খনি।

'জিজ্ঞেস করলাম, সে জানল কি করে?

'বলল, অনেক খোঁজখবর করে জেনেছি। ম্যানিকা প্রদেশে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে জানিয়েছে, সলোমনের বিকৃত উচ্চ জানিয়েছে, ওই সুলিমান পর্বতমালারই কোথাও বাস করে একট গোত্র। জুলুদের ভাষার সঙ্গে অনেক মিল আছে তাদের ভাষ অনেক উন্নত। গায়েগতরেও আরেকটু বড়। মহা পণ্ডিত জ অনেক অনেকদিন আগে সাদা মানুষের কাছে শিক্ষা পেয়ে খনির সন্ধান জানে ওই জাদুকরেরা।' থামল ইভান্স।

'ইভান্সের গপ্পো শুনে তখন হেসেছিলাম। এর পরদিন পেরিয়ে গেল দীর্ঘ বিশটা বছর। হাতি শিকারিদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রাণ হাতে করে চলতে হয়। এই পেশায় নি

লোকই বাঁচে। যাক সে-কথা। বিশ বছর পরে আবার শুনলাম সুলিমান পর্বতমালার কেচ্ছা, এবারে আরও বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। ম্যানিকার সীমান্ত ছাড়িয়ে গেছি সেবার, সিটাণ্ডার ক্রাল নামে একটা জায়গায় রয়েছি। সাংঘাতিক খারাপ জায়গা। খাবার পাওয়া যায় না। শিকার কম! আবহাওয়াও খারাপ। পড়লাম জ্বরে। জ্বর কি যেমন-তেমন জ্বর! মরি আর কি! এই সময়ই একদিন আমার তাঁবুতে এসে হাজির এক পর্তুগিজ, সঙ্গে এক দেশী চাকর। লম্বা-পাতলা লোকটাকে দেখে ভালই মনে হল। কালো বড় বড় চোখ। পাকানো ধূসর গোঁফ। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে, স্প্যানিশে আমার দখলও তারই মত। কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারলাম আমরা। জানলাম, ওর নাম হোসে সিলভেস্ত্রা। ডেলাগোয়া উপসাগরের ধারে বাড়ি। জ্বরের জ্বালায় বেশি আলাপ-সালাপ করতে পারলাম না। পরদিন সকালে বিদায় নিতে এল সিলভেস্ত্রা। পুরানো কায়দায় টুপি খুলে নিতে নিতে বলল, গুডবাই, সিনর। আবার যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে—যদি দেখা হয় কোনদিন, দুনিয়ার সেরা ধনী আমি। আপনার এই মেহমানদারীর কথা সেদিনও মনে থাকবে আমার। তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সিলভেস্ত্রা। জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম, বেশি হাসতে পারিনি। কোনমতে উঠে টলতে টলতে এসে বসেছিলাম তাঁবুর বাইরে, ছায়ায়। দেখেছিলাম, পশ্চিম দিগন্তে মরুভূমিতে ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে দুটো মানুষ। লোকটার মাথায় স্থিরতা নিয়ে সে-মুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছিল মনে।

'এক হপ্তা পেরিয়ে গেল। সুস্থ হয়ে উঠেছি অনেকখানি। তাঁবুর বাইরে ছায়ায় বসে আছি সেদিন বিকেলে। মুরগির আধপচা একটা ঠ্যাং চিবুচ্ছি। এক কাফ্রির কাছ থেকে এক টুকরো কাপড়ের বদলে কিনেছি ওই ঠ্যাং। অন্য সময় হলে ওই কাপড় দিয়ে বিশটা আস্ত মুরগি কেনা যেত। ঠ্যাং চিবুচ্ছি, চেয়ে আছি পশ্চিম দিকে। ভীষণ গরম। বালির সাগরের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে লাল সূর্য। হঠাৎই দেখতে পেলাম ওকে। একজন মানুষ। শ'তিনেক গজ দূরের একটা টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের কোট দেখে বোঝা যায়, ইউরোপিয়ান। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। অনেক কষ্টে হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সোজা হল। দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে লাগল টলতে কয়েক গজ এগিয়ে পড়ে গেল আবার। করুণ দৃশ্য। সঙ্গী এক শিকারিকে টাকে তুলে নিয়ে আসতে বললাম। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ও কে?'

সিলভেস্ত্রা,' বলল ক্যাপ্টেন গুড।

ংবা বলা যায় সিলভেস্ত্রার চামড়ায় ঢাকা জ্যান্ত কঙ্কাল। মারাত্মক জ্বরে ছ মুখ। কোটরের আশপাশে মাংসের ছিটেফোঁটাও নেই। ফলে, মনে হয় আছে কালো চোখ দুটো। চোয়ালের হাড় আর মাথার খুলি কামড়ে ধরে ন হলুদ চামড়া। মাথার চুল সব সাদা।'

নিহ্!' গুঙিয়ে উঠল সিলভেস্ত্রা। ঠোঁট ফেটে গেছে, জিভ সাংঘাতিক চে হয়ে গেছে রঙ।

ান্য দুধ মিলিয়ে খেতে দিলাম ওকে। বড় বড় ঢোকে গিলতে লাগল শেষ হতে না হতেই আবার জ্বর এসে গেল তার। পড়ে গেল তে লাগল। বকার ভেতর এসে যাচ্ছে সুলিমানস পর্বতমালা, হীরা তুলে নিয়ে গেলাম তাঁবুর ভেতর। ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, ওর রা গেল না। রাত এগারোটা নাগাদ একটু শান্ত হল ও। শুয়ে ঘুমিয়েই পড়লাম। কাকভোরে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও আলো, উঠে বসে তাঁবুর দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে সিলভেস্ত্রা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে কঙ্কালসার দেহটা। কেমন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুই বললাম না। ক্রমে আলো ফুটল। সূর্য উঠল। দূরে, র চূড়ায় গিয়ে আঘাত হানল যেন সূর্যের লাল রশ্মি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ওইই যে,' মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল মুমূর্ষু লোকটা। লম্বা হাড্ডিসার একটা হাত তুলে নির্দেশ করল সুলিমান পবর্তমালার দিকে। 'কিন্তু ওখানে কোন দিনই যেতে পারবে না। পারবে না কেউই!'

হঠাৎ থেমে গেল সে। দ্রুত কি সিদ্ধান্ত নিল মনে মনে। আস্তে করে ফিরল আমার দিকে। 'বন্ধু, কোথায় তুমি? কোথায় আছ? আমার নজর ঘোলা হয়ে আসছে! দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে!'

'এই যে আমি, এখানে,' বললাম। 'শুয়ে পড়। বিশ্রাম নাও।'

'হ্যাঁ, শোব,' বলল সিলভেস্ত্রা। 'শিগগিরই শোব, চিরদিনের জন্যে। তার আগে একটা কাজ শেষ করে নিই। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ। তোমাকেই দিয়ে যাব লেখাটা। হয়ত ওখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে। অবশ্য যদি মরুভূমি পেরোতে না পার। ওই হারামী মরুই আমার চাকরটাকে খেয়েছে, আমাকেও শেষ করেছে।'

মলিন শার্টের ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা প্যাকেট বের করে আনল সিলভেস্ত্রা। ওপরের চামড়ার মোড়ক খুলতেই বেরোল স্যাবল অ্যান্টিলোপের চামড়ায় তৈরি একটা বোয়ের টোবাকো পাউচ। পাউচের ভেতরের জিনিসটা বের করার চেষ্টা করল সে দুর্বল আঙুলে, পারল না। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'বের কর।'

পুরানো ছেঁড়াখোড়া হলদে মখমলে মোড়া একটা মোড়ক বের করলাম। কাপড়টার গায়ে কি যেন লেখা রয়েছে। অক্ষরগুলো স্পষ্ট না। কাপড়ের মোড়কের ভেতর থেকে বেরোল একটুকরো কাগজ।

দুর্বল গলায় বলে গেল সিলভেস্ত্রা, 'তিনশো বছর আগের কথা। আমার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন, নাম হোসে ডা সিলভেস্ত্রা। দেশভ্রমণের সাংঘাতিক নেশা ছিল তাঁর। একদিন পাড়ি জমান আফ্রিকায়। তাঁর আগে এ অঞ্চলে আর কোন পর্তুগিজ আসেনি। আর শ্বেতাঙ্গদের মাঝে একমাত্র তিনিই যেতে পেরেছেন সুলিমান পর্বতমালার কাছাকাছি। তাঁর সঙ্গে ছিল একজন কাফ্রি গোলাম। ওই পর্বতেরই এক গুহায় মারা যান সিলভেস্ত্রা। কোন কারণে বাইরে ছিল তখন গোলাম। ফিরে এসে দেখল মরে পড়ে আছে মনিব। মনিবের লাশের পাশেই পড়ে আছে একটুকরো মখমল, তাতে কিসব লেখা রয়েছে। কাপড়টা তুলে যত্ন করে রাখল গোলাম। অনেক কষ্টে ফিরে গেল একদিন আমাদের বাড়িতে, ডেলাগোয়ায়। তখন থেকেই আমাদের কাছে রয়েছে কাপড়টা। কেউ পড়ার কথা ভাবেনি, আমি ছাড়া। পড়ে এখন জান দিতে হচ্ছে। বন্ধু, তোমাকে দিয়ে গেলাম এটা। তোমার কাছেই রেখ, আর কাউকে দিও না। পারলে যাবার চেষ্টা কর ওই পর্বতের কাছে। হয়ত দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষ হয়ে ফিরে আসবে।'

চুপ করল সিলভেস্ত্রা। একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়ল আবার। আবার এল জ্বর। প্রলাপ বকা শুরু হল। তারপরেই চিরদিনের জন্যে চোখ বুজল হতভাগা লোকটা। ঈশ্বর ওর আত্মার মঙ্গল করুন!

গভীর গর্ত খুঁড়ে কবর দিলাম সিলভেস্ত্রাকে। বুকের ওপর চাপিয়ে দিলাম একটা বড় পাথর, শেয়ালে টেনে যাতে তুলতে না পারে। তারপর আর থাকিনি ওই এলাকায়। ফিরে এসেছি।

'লেখাটা কোথায়?' জানতে চাইলেন স্যার হেনরি।

'কি লেখা ছিল ওতে?' প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন গুড। 'আর কাউকে দেখিয়েছেন?'

'দেখিয়েছি,' বললাম। 'একজন পর্তুগিজ ব্যবসায়ীকে। লেখাটা স্প্যানিশ ভাষায়। আধমাতাল ছিল তখন ব্যবসায়ী। ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছে। পরদিন সকালেই ভুলে গেছে ওটার কথা। মূল লেখাটা রেখে দিয়েছি আমার ডারবানের বাড়িতে। সিলভেস্ত্রার লেখা কাগজটাও আছে ওখানেই। তবে আপনারা যদি দেখতে চান,' পকেট থেকে নোটবুক বের করলাম। একটুকরো কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরলাম, 'এই যে। ওটার ইংরেজি অনুবাদ।'

কাগজটা দুজনেই দেখল। ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'আরে, একটা ম্যাপও আছে!'

'মূল লেখাতেও আছে,' বললাম। 'পথের নির্দেশ।' কাগজের লেখা পড়ে শোনালাম ওদের, 'আমি, হোসে ডা সিলভেস্ত্রা, ছোট্ট এই গুহায় অনাহারে মারা যাচ্ছি। এটা ১৫৯০ সাল। নিজের পোশাকের ছেঁড়া টুকরোতে লিখছি। কালি আমার গায়ের রক্ত। কলম ছোট সরু একটুকরো হাড়। যে গুহাটাতে আছি, তার দক্ষিণ প্রান্তের দুটো পর্বতের উত্তরেরটার নাম দিয়েছিঃ সেবা-র দুই স্তন। উত্তরের স্তনের বোঁটায় তুষার নেই। গুহাতে ফিরে এসে লেখাটা যদি পায় আমার গোলাম, যদি এটা নিয়ে যেতে পারে ডেলাগোয়ায়, যদি আমার বন্ধুর (নাম পড়া যায় না) হাতে পড়ে, তাহলে কথাটা রাজার গোচরে আনার অনুরোধ জানাচ্ছি বন্ধুকে। হয়ত একদল সৈন্য পাঠাবেন রাজা। অবশ্যই সৈন্যদের সঙ্গে যেন বেশ কয়েকজন জ্ঞানী পাদ্রীকে পাঠানো হয়। ভয়াবহ মরুভূমি পেরিয়ে আসতে হবে ওদের, পরাজিত করতে হবে দুর্ধর্ষ কুকুয়ানাদের, ধ্বংস করতে হবে তাদের শয়তানী জাদু। তাহলেই রাজা হবেন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী রাজা। মৃত্যু দেবতার পেছনে সলোমনের রত্ন কক্ষে ঢুকেছি আমি। নিজের চোখে দেখেছি সে অফুরন্ত সম্পদ, হীরা স্তূপ। কিন্তু সে ধন আনার ক্ষমতা আমার হয়নি। ভয়ঙ্কর জাদুকরী গাগুলের কবল থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি, এই বেশি। পথ চিনে আসার জন্যে একটা ম্যাপও এঁকে দিচ্ছি। ম্যাপে নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে এসে সেবা-র বাম স্তনে উঠতে হবে, তুষার পেরিয়ে চড়তে হবে স্তনের বোঁটায়। বোঁটার উত্তর ধার দিয়ে নেমে গেছে সলোমানের তৈরি করানো মহান পথ। ওই পথ ধরে তিন দিন চললে পৌঁছানো যাবে রাজপ্রাসাদে। যে-ই আস, হত্যা কর গাগুলকে। আমার আত্মার জন্যে দোয়া করার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি। বিদায়।

হোসে ডা সিলভেস্ত্রা।'

পড়া শেষ করলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দুজনেই।

'সারা দুনিয়া চক্কর দিয়েছি,' খানিক নীরবতার পর কথা বলল ক্যাপ্টেন। 'একবার নয়, দুবার। কিন্তু এমন আশ্চর্য কাহিনী শুনিনি কোথাও।'

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি, 'ঝড়ের রাতে আমাদের কেচ্ছা শোনাচ্ছেন না তো?'

'ঝট করে চোখ ফেরালাম তাঁর দিকে। 'আপনার তাই মনে হচ্ছে!' দ্রুত হাতে কাগজটা ভাঁজ করে নোট বইয়ে রেখে পকেটে ঢোকালাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'খামোকা কেচ্ছা শুনে আর কি লাভ? চলি!'

বিশাল একটা থাবা এসে পড়ল আমার কাঁধে। 'প্লীজ, মিস্টার কোয়াটারমেইন!' লজ্জিত গলায় বললেন স্যার হেনরি, 'বসুন। আমি ঠিক সেভাবে বলিনি কথাটা! আসলে, কাহিনীটা এত অদ্ভুত...'

'ডারবানে গিয়ে আসল লেখাটা দেখাব আপনাকে,' বাধা দিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম।

'বসুন, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি। 'মাপ চাইছি...'

এবার আমি লজ্জা পেলাম। বসে পড়লাম। অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আরে হ্যাঁ, আপনার ভাইয়ের কথাই বলা হয়নি এখনও। ওর সঙ্গী জিমকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। বেচুয়ানার লোক, ভাল শিকারি, আর খুব বুদ্ধিমান। ওদের রওনা হবার দিন সকালে, আমার ওয়াগনের পাশে বসে তামাক কাটছে জিম। জিজ্ঞেস করলাম, 'হাতি শিকারেই তো যাচ্ছ তোমরা, জিম?'

'না, বাস (বস্),' জবাব দিল সে, 'আইভরির চেয়েও দামি জিনিসের খোঁজে যাচ্ছি।

'মানে?' কৌতূহল জাগল। বললাম, 'তবে কি সোনার খোঁজে?'

'না, বাস। আরও দামি জিনিস,' রহস্যময় হাসি হাসল জিম।

রাগ লাগল। এভাবে রহস্য করছে কেন! সরাসরি বলে ফেললেই তো হয়! বেটা

www.boiRboi.blogspot.com

নেটিভ আমার সাথে মস্করা করছে! তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে চাইলাম না। চুপ করে গেলাম।

ব্যাপারটা জিম বুঝল কিনা, জানি না। তামাক কাটা শেষ করে মুখ তুলল সে। ডাকল, 'বাস।'

জবাব দিলাম না।

'বাস,' আবার ডাকল সে।

'কি হল! চেল্লাচ্ছ কেন?' চাইলাম ওর দিকে।

'বাস, হীরার খোঁজে যাচ্ছি আমরা।'

'হীরা! ভুল করছ তো, ভুল দিকে যেতে চাইছ। হীরার খনি ওদিকে নয়।'

'বাস, সুলিমান বার্গের নাম শুনেছেন?'

অবাক হলাম। সুলিমান পর্বতমালাকেই অনেকে সুলিমান বার্গ বলে। বললাম, 'শুনেছি।'

'ওখানকার হীরার খনির কথা শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, একটা গল্প শুনেছি।'

'গল্প নয়, বাস। ওই অঞ্চল থেকে একটা মেয়েলোক এসেছিল নাটালে, কোলে এক বাচ্চা। ওই মেয়েলোকটাই হীরার কথা বলেছে আমাকে। সে এখন নেই, মারা গেছে।'

'খামোকা পাগলামি করছ তোমরা। তোমার মালিক তো মরবেই, তুমিও মরবে। ওই ভয়ানক মরুভূমি পেরোতে পারবে না তোমরা।'

হাসল জিম। মরতে তো একদিন হবেই, বাস। তাছাড়া, এদিকে হাতিও কমে এসেছে। এ পেশায় থেকে না খেয়ে মরতে হবে এমনিতেই। তার চেয়ে, চেষ্টা করেই দেখি একবার, যেতে পারি কিনা।'

'পিপাসায় গলা যখন শুকিয়ে আসবে, হলুদ জ্বরে খেয়ে নেবে শরীরের মাংস, মাথার ওপর শকুন চক্কর মারবে, তখন বল এসব বড় বড় কথা! যত্তোসব!' চুপ করে গেলাম।

আধঘন্টা পরেই নেভিলির ওয়াগন চলতে শুরু করল। দৌড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল জিম। বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি, বাস। আর কোনদিন দেখা হবে কিনা, জানি না। কোন অপরাধ করে থাকলে মাপ করে দেবেন। চলি।'

'সত্যি সুলিমান বার্গে যাচ্ছ তোমরা, জিম? নাকি মিছে কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সত্যি যাচ্ছি, বাস। একবার কপাল পরীক্ষা করে দেখতে চাই। মিস্টার নেভিলিরও এইই কথা।'

'ও, যাবেই তাহলে! ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও।' পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে লিখলামঃ দুটো স্তনের বাম দিকেরটায় উঠতে হবে। তুষার পেরিয়ে চড়তে হবে স্তনের বোঁটায়। বোঁটার উত্তর ধার দিয়ে নেমে গেছে সলোমনের তৈরি করানো মহান পথ। ওই পথ ধরে তিন দিন চললে পৌঁছানো যাবে রাজপ্রাসাদে। লেখা কাগজটা জিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম,' এটা রাখ। ইনাইয়াটি পৌঁছে দেবে এটা তোমার মনিবের হাতে। তার আগে নয়।'

'ঠিক আছে, বাস।' কাগজটা নিল জিম।

'আর বলবে, কাগজে লেখা নির্দেশ অনুসারে যেন চলে।' দেখলাম, অনেকখানি এগিয়ে গেছে নেভিলির ওয়াগন। 'আবার বলছি, ইনাইয়াটির আগে কাগজটা দেবে না তাকে। তাহলে ফিরে এসে হাজারো প্রশ্ন শুরু করবে আমাকে। এত জবাব দিতে পারব না। বুঝেছ?'

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে চলে গেল জিম। স্যার হেনরির দিকে চেয়ে বললাম, 'এরপর ওদের ভাগ্যে কি ঘটল, আর কিছু জানি না আমি...'

'আমি আমার ভাইয়ের খোঁজে যাব,' বললেন স্যার হেনরি। 'দরকার হলে সুলিমান পর্বতমালার ওপাশেও যাব আমি। জর্জের সত্যি কি হয়েছে, না জেনে ফিরব না। মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?'

এভাবে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন স্যার হেনরি, আশা করিনি। থমকে গেলাম। সুলিমান বার্গে যাব! এই বুড়ো বয়েসে অপঘাতে মরতে? বললাম, 'না। সিলভেস্ত্রার মত কষ্ট পেয়ে মরার শখ নেই আমার। তাছাড়া আমার ছেলে আছে। আমি মরে গেলে তাকে দেখবে কে? না, স্যার হেনরি, আমি যেতে পারব না। মাপ করবেন।'

স্যার হেনরি আর ক্যাপ্টেন গুড, দুজনেই খুব নিরাশ হলেন।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি, 'আমাকে যেতেই হবে। আপনি যদি যান, খুবই উপকার হয়। আচ্ছা, যদি আপনার ছেলের ভার আমি নিই? মানে, একটা বিশেষ অঙ্কের টাকা ব্যাংকে জমা করে দেই তার নামে? আপনি না থাকলেও তার পড়াশোনার অসুবিধে হবে না। টাকা তো আছেই, চালিয়ে নিতে পারবে। আর আমার সঙ্গে যাবার জন্যে মোটা টাকা দেব আপনাকে। এই অভিযানের সমস্ত খরচ-খরচা আমার। কিন্তু, পথে যদি হাতি শিকার করতে পারি, আইভরির মূল্য বাবদ তিন ভাগের সমান এক ভাগ আপনিও পাবেন।'

'খুব ভাল প্রস্তাব,' বললাম আমি। 'আমার টাকা নেই, কাজেই টাকার দরকার আছে। ছেলে পড়ছে মেডিক্যাল কলেজে, খরচ আছে তো। তবু, এখুনি কথা দিতে পারছি না। একটু ভেবে দেখার সময় দিন।'

'ঠিক আছে,' বললেন স্যার হেনরি।

রাত অনেক হয়েছে। উঠলাম। ফিরে এলাম নিজের কেবিনে। সিলভেস্ত্রা আর তার হীরার খনির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়।

অনেক দিন পর সে-রাতে স্বপ্ন দেখলাম সিলভেস্ত্রাকে।

তিন

পুরানো জাহাজ ডানকেল্ড। গতি এমনিতেই কম। তার ওপর খারাপ আবহাওয়া। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে ডারবান পৌঁছুতে পারল না জাহাজ।

রোজই স্যার হেনরি ক্যাপ্টেন গুডের সঙ্গে দেখা হয় আমার। আলাপ-আলোচনাও হয়। কিন্তু পর পর দুদিন আর সলোমনের খনির ব্যাপারে কোন কথাই বললাম না ওদের সঙ্গে। শিকারের গল্প বলি, আরও অন্যান্য রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শোনাই। কখনও মুগ্ধ হয় ওরা, কখনও বিস্মিত। সলোমনের খনি কিংবা তাঁর ভাইয়ের সম্পর্কে আর একটি কথাও বললেন না স্যার হেনরি।

পাঁচ দিন কেটে গেল। আবহাওয়া ভাল হয়ে গেছে। জানুয়ারির চমৎকার উষ্ণ বিকেল। নাটালের উপকূল ধরে চলছে এখন ডানকেল্ড। রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পাশেই রয়েছেন স্যার হেনরি আর ক্যাপ্টেন গুড। প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখছেন ওঁরা। আমিও দেখছি। বার বার দেখছি এ দৃশ্য, কিন্তু তবু পুরানো হয় না। সবুজ ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে মাঝেমাঝেই উঠে গেছে লাল বালির পাহাড়। সবুজের কোথাও কোথাও খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে বাথান বানিয়েছে স্থানীয় কাফ্রিরা। বালির সৈকত নেই এখানে। একেবারে পানির ওপর নেমে এসেছে সবুজ ঘাস, ঝোপঝাড়। নীল সাগর আর সবুজের মাঝে সীমানা টেনেছে ঢেউয়ের সাদা ফেনা। উপকূলের আকর্ষণ ছেড়ে সরে আসতে পারছে না, নাচানাচি করছে ওখানেই।

বন্দরে এসে ঢুকতে ঢুকতে রাত হয়ে গেল। এখন আর বাড়ি যাওয়া যাবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

রাতটা জাহাজেই কাটাতে হবে। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হল ডানকেল্ড থেকে। বন্দর-কর্তৃপক্ষ আর ডারবানের লোকদের জানানো হল, ইংল্যাণ্ড থেকে ডাক এসে পৌঁছেছে। একটা লাইফবোট এসে ডাক নিয়ে চলে গেল।

রাতের খাওয়া সেরে এসে ডেকে বসলাম তিনজনে। আকাশে বিশাল রূপালি চাঁদ। লাইটহাউসের আলোকেও ম্লান করে দিয়েছে ঝকঝকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। তীর থেকে ভেসে আসছে বন্দরের নেশা ধরানো গন্ধ।

জাহাজের হুইলের দিক থেকে মুখ ফেরালেন স্যার হেনরি। বুঝতে পারলাম, এবার আসবে জিজ্ঞাসা। ঠিকই অনুমান করেছি। প্রশ্ন করলেন তিনি, 'মিস্টার কোয়াটারমেইন, আমার প্রস্তাব? ভেবেছেন নিশ্চয়?'

'ঠিক,' স্যার হেনরির প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি করল যেন ক্যাপ্টেন গুড। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু ঠিক করেছেন? সলোমনের খনিতে যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

ডেক চেয়ার থেকে উঠলাম। পাইপ ঝাড়তে হবে। আসলে তখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি আমি। কিন্তু ওদেরকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখাও নিতান্তই অভদ্রতা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম রেলিঙের ধারে। উপুড় করলাম পাইপটা। জ্বলন্ত পোড়া তামাকগুলো পানি ছোঁয়ার আগেই নিয়ে ফেললাম সিদ্ধান্ত। এটা ঘটে। দীর্ঘ সময় ভাবনাচিন্তা করেও কিছু একটা ব্যাপারে হয়ত সিদ্ধান্ত নেয়া গেল না। কিন্তু সময় আর পরিস্থিতি মাত্র দুয়েক সেকেণ্ডেই ওই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।

ফিরে এলাম। 'হ্যাঁ,' বসতে বসতে বললাম, 'আমি যাব। তবে কিছু শর্ত আছে আমার। স্যার হেনরি যদি রাজি থাকেন...'

'কি শর্ত?' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন স্যার হেনরি।

'একঃ যাবার পথেই হাতি শিকার করব আমরা। আইভরিগুলো কোথাও রেখে যাব। আমি ফিরে না এলে তিন ভাগের এক ভাগ পাবে আমার ছেলে। দুইঃ আমার সাহায্যের জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড দিতে হবে আমাকে। সেটা ডারবান ত্যাগ করার আগেই। ওই টাকা আমি ছেলের নামে ব্যাংকে রেখে যাব। তিনঃ লণ্ডনে গাইজ হাসপাতালে পড়ছে আমার ছেলে। ডাক্তারি পাশ না করা পর্যন্ত মাসে দুশো পাউণ্ড করে মাসোহারা দিতে হবে ওকে। আপনার ব্যাংকে চিঠি লিখে ওই টাকার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।'

'আমি রাজি,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন স্যার হেনরি।

'হয়ত ভাবছেন,' বললাম, 'চামারের মত দর কষাকষি করছি। বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে। আমি একা হলে কোন কথা ছিল না। বেরিয়ে পড়তাম। মরলে মরতাম, বাঁচলে বাঁচতাম। কিন্তু আমার খেয়ালিপনা কিংবা চক্ষুলজ্জার জন্যে আমার ছেলে কষ্ট করবে কেন?'

'আপনার অবস্থা বুঝেছি আমি,' বললেন স্যার হেনরি। 'চামার তো ভাবছি না, বরং আপনার দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা করছি। শ্রদ্ধা আরও বাড়ল আপনার ওপর।'

পরদিন সকালে জাহাজ থেকে নামলাম। দুজনকেই নিয়ে এলাম আমার বাড়িতে। ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম বাড়িটা দেখে দুজনেই খুব প্রশংসা করলেন।

কথামত তাঁর কাজ করলেন স্যার হেনরি। আমার পাঁচশো পাউণ্ড দিয়ে দিলেন। আমার ছেলে হেনরিকে মাসে মাসে টাকা পাঠানোর জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন ব্যাংককে, লিখিতভাবে। তাঁর কাজ তিনি করেছেন, এবার আমার পালা।

খরচের টাকা নিয়ে নিলাম স্যার হেনরির কাছ থেকে। প্রথমেই বড় দেখে একটা ওয়াগন কিনলাম। বাইশ ফুট দীর্ঘ ওয়াগনটার চাকার অ্যাক্সেল লোহার তৈরি, সাধারণ গাড়ির মত কাঠের নয়। পাকা কাঠ দিয়ে তৈরি গাড়ি। কিছুদিন খনির কাজে লাগানো হয়েছে। জেনেশুনেই কিনেছি। খনির কাজ যা তা জিনিসে হয় না। তার মানে গাড়ির কাঠ খুবই ভাল।

এরপর কিনলাম গাড়ির জন্যে গরু। ষোলোটা বলদ হলেই এ গাড়ি টানতে পারবে, কিন্তু আমি কিনলাম চারটে বেশি। এগুলো অতিরিক্ত। দুর্গম যাত্রা। অসুখ বা অন্য কিছু হয়ে মরে যেতে পারে দু'চারটে বলদ। অতিরিক্ত রাখাই ভাল। সাধারণ বলদ নয় ওগুলো। জুলুদের বাথান থেকে এসেছে, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা অপরিসীম, চলতেও পারে আর সব বলদের চেয়ে দ্রুত।

ওষুধ কেনার ঝামেলা আমাকে পোহাতে হল না, যদিও সঙ্গে রইলাম আমি। জানলাম চিকিৎসার ব্যাপারে মোটামুটি জ্ঞান তাঁর আছে। বেশি ওষুধ নিতে মানা করলাম। বোঝা যত কম হয়, ভাল। ক্যাপ্টেন বুঝলেন। অতি দরকারিগুলো ছাড়া বাকি সব ছাঁটাই করে দিলেন লিস্ট থেকে।

টুকিটাকি অন্যান্য জিনিসপত্রও কেনা হল। অস্ত্রশস্ত্র কেনার প্রয়োজন হল না। ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক নিয়ে এসেছেন স্যার হেনরি। আমার তো আছেই।

এরপর লোকজন জোগাড়ের পালা। তিনজনে আলোচনা করে ঠিক করলাম পাঁচজন কাজের লোক দরকার আমাদের। একজন ড্রাইভার, একজন পথ-প্রদর্শক আর তিনজন চাকর।

ড্রাইভার আর গাইড পেয়ে গেলাম সহজেই। দুজনেই জুলু। একজনের নাম গোজা, অন্যজন টম। চাকর জোগাড় করতে গিয়েই হিমশিম খেতে হল। সত্যিকারের সাহসী আর বিশ্বাসী চাকর পাওয়া খুব কঠিন। দুর্গম যাত্রায় চলেছি, অনেক ক্ষেত্রে চাকরদের ওপরই নির্ভর করবে আমাদের জীবন।

খুঁজেপেতে দুজন জোগাড় হল। একজন হটেনটট, নাম ভেন্টভোগেল। আরেকজন জুলু, বয়েস কম, নাম খিবা। খুব ভাল ইংরেজি বলতে পারে। ভেন্টভোগেলকে আগে থেকেই চিনি। খুব পরিশ্রমি। ভাল ট্র্যাকার। তবে একটা বদভ্যাস আছে। মদে বড্ড আসক্তি তার।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্য আরেকটা লোকের সন্ধান পেলাম না। হালই ছেড়ে দিয়েছি প্রায়, এমনি সময় এক সন্ধ্যায় এল সে। পরদিনই রওনা হব আমরা। জিনিসপত্র গোছগাছ করছি। খিবা এসে খবর দিল, বাইরে একজন নিগ্রো দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। লোকটাকে নিয়ে আসতে বললাম।

ঘরে এসে ঢুকল এক লম্বা নিগ্রো। সুন্দর চেহারা। গায়ের রঙ আর সব নিগ্রোর মত কালো নয়, একটু ফিকে। বয়েস তিরিশ মত। হাতে একটা আসেগাই অর্থাৎ জুলু বর্শা। স্যালুটের ভঙ্গিতে বর্শাসুদ্ধ ডান হাতটা তুলল সে।

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমবোপা,' শান্ত, ভারি কণ্ঠস্বর।

'তোমাকে আগেও কোথাও দেখেছি!'

'হ্যাঁ, ইনকোসি,' বলল আমবোপা। শ্বেতাঙ্গদের সম্মান জানিয়ে ইনকোসি বলে ডাকে জুলুরা। 'ইসানধ্লুয়ানায় দেখেছন। সেই যে, সেই লড়াইয়ের আগের দিন।'

মনে পড়ল। সেবার লর্ড শেলমসফোর্ডের গাইড হিসেবে এক রোমঞ্চকর অভিযানে বেরিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে কিছু জুলুর সঙ্গে লড়াই বাধে আমাদের। সে আরেক কাহিনী। অন্য এক সময় বলব।

'তা কি চাই?' জানতে চাইলাম।

'মাকুমাজান,' বলল আমবোপা। 'শুনলাম, অনেক উত্তরে যাচ্ছেন এবার আপনারা। সঙ্গে যাচ্ছেন সাগর পেরিয়ে আসা দুজন ইনকোসি। সত্যি?'

কাফ্রি ভাষায় মাকুমাজান মানে, যে সব সময় হুঁশিয়ার থাকে। বললাম, 'সত্যি হলে?'

'শুনলাম, এখান থেকে এক চাঁদের পথ, ম্যানিক ছাড়িয়ে যাবেন আপনারা, চলে যাবেন লুকাঙ্গা নদীর ওদিকে। ঠিক?'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমরা যেখানে খুশি যাই, তাতে তোমার কি?' সন্দেহ জাগল মনে। আমাদের এই অভিযানের আসল কারণ গোপন রাখতে চাই।

'আমি যাব আপনাদের সঙ্গে, সাদা মানুষ।'

আমবোপার গলায় কিছু একটা ছিল, ঝট করে চোখ তুললাম ওর দিকে। সাদা মানুষের সঙ্গে এভাবে তো কথা বলে না কাফ্রিরা! কেমন একটু উদ্ধত গলার স্বর! বলেই ফেললাম, 'আরেকটু ভদ্রভাবে কথা বলতে হয়। সাদা মানুষ নয়, বলবে ইনকোসি।' ওকে কথাটা হজম করার জন্যে সময় দিয়ে বললাম, 'এখন বল, তোমার নাম কি সত্যিই আমবোপা? তোমার ক্রাল (বাড়ি) কোথায়?'

'আমি আমবোপা। বাড়ি অনেক অনেক উত্তরে, হাজার বছর আগে জুলুরা বাস করত যেখানে। যেখানে মহা প্রতাপে রাজত্ব করত রাজা চাকা। ওখানে আজ আর কোন ঘর নেই আমার। শিশুকালে নিজের দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। তারপর ঘুরে বেড়িয়েছি দেশে দেশে, বয়েসকালে যোগ দিয়েছি সেনাবাহিনীতে। মহান সেনাপতি আমস্লোপোগাসির দলে। হাতে ধরে লড়াই শিখিয়েছেন আমাকে তিনি। তারপর থেকে শুধু একের পর এক লড়াই করে গেছি। আর ভাল লাগে না। আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে চাই। আপনারা ওদিকে যাচ্ছেন শুনে এলাম, যদি সঙ্গে নেন। আমি কাজের লোক, সঙ্গে নিলে ভুল করবেন না। কাজ পাবেন। বিনিময়ে পয়সা চাইব না।'

আমবোপার কথার ধরনে রীতিমত অবাক হয়েছি আমি। আর দশজন সাধারণ জুলুর চেয়ে ও আলাদা। ভেতরে গভীর কিছু একটা রয়েছে, সন্দেহ জাগল মনে। স্যার হেনরি আর ক্যাপ্টেন গুডের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম।

কি যেন ভাবলেন স্যার হেনরি। আমবোপার কাছে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ওকে গায়ের কোট খুলে ফেলতে বলুন।'

স্যার হেনরির নির্দেশ অনুবাদ করে শোনালাম আমবোপাকে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না আমবোপা। লম্বা ঝুলওয়ালা গ্রেটকোটটা খুলে ফেলে দিল গা থেকে। কোমরের ওপরে জুলু কায়দায় জড়ানো রয়েছে একটুকরো কাপড়। গলায় সিংহের নখের মালা। সত্যি, নেটিভদের মাঝে এত সুন্দর লোক আগে দেখিনি! লম্বায় ছয় ফুট তিন, সেই অনুযায়ী চওড়া কাঁধ, চমৎকার স্বাস্থ্য। ফিকে কালো শরীরের জায়গায় জায়গায় গভীর ক্ষতচিহ্ন, ভয়াবহ বহু লড়াইয়ে জেতার সাক্ষী।

আরও এক কদম এগিয়ে গেলেন স্যার হেনরি। আমবোপার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। চাইলেন তার সুন্দর গর্বিত মুখের দিকে।

'চমৎকার জোড়া,' বলল গুড। 'গায়েগতরে দুজনেই এক, শুধু চামড়ার রঙ ছাড়া।'

'তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার, আমবোপা,' বললেন স্যার হেনরি। 'আমার চাকর হিসেবে বহাল করলাম তোমাকে।'

বুঝল না, কিন্তু স্যার হেনরির কথা অনুমান করে নিল বুদ্ধিমান আমবোপা। জুলু ভাষায় জবাব দিল, 'আপনি একজন সত্যিকার পুরুষ। আরেকজন পুরুষের কদর বুঝেছেন।'

চার

জানুয়ারির শেষ দিকে ডারবান ছাড়লাম আমরা। দীর্ঘ সাতশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ম্যাটাবেল প্রদেশের সীমান্তে শেষ ব্যবসাকেন্দ্র ইনাইয়াটিতে এসে পৌঁছুলাম। এখানেই এক সময় রাজত্ব করত মহাপরাক্রমশালী, নিষ্ঠুর, শয়তান রাজা লবেংগুলা। লুকাঙ্গা আর

কালুকুই নদী যেখানে এসে মিশেছে, তার কাছাকাছিই রয়েছে সিটাণ্ডার ক্রাল, ইনাইয়াটি থেকে তিনশো মাইলেরও বেশি দূরে। মাঝে পথ ভীষণ দুর্গম। তার ওপর রয়েছে ভয়াবহ সেৎসি মাছি। গাধা আর মানুষ ছাড়া সব জানোয়ারের জন্যে মারাত্মক। গবাদি পশুর তো যম ওই মাছি। কাজেই ওয়াগনে যাত্রা এখানেই শেষ। এরপর পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।

আমাদের বিশটা বলদের বারোটা অবশিষ্ট রয়েছে। একটা মারা গেছে সাপের কামড়ে, তিনটে মরেছে রোগে ভুগে, একটা তৃষ্ণায়, বাকি তিনটে মরেছে বিষাক্ত টিউলিপ তৃণ খেয়ে। আরও পাঁচটা মারা যেতে বসেছিল ওই একই তৃণ খেয়ে, সময়মত চিকিৎসা করাতে সেরে উঠেছে।

জিনিসপত্র বের করে নিলাম ওয়াগন থেকে। বলদগুলোসহ গাড়িটা গোজা আর টমের দায়িত্বে রেখে ইনাইয়াটি ছাড়লাম আমরা। আমবোপা, খিবা আর ভেন্টভোগেল ছাড়াও জিনিসপত্র বওয়ার জন্যে বারোজন কুলি নিয়েছি সঙ্গে।

শুরুতে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চললাম আমরা। সবার আগে আগে চলেছে আমবোপা। হঠাৎ গান ধরল সে। জুলু গান। কথাগুলো বড় সুন্দর। ওর চরিত্রের আরেকটা দিক উন্মোচিত হল আমাদের কাছে। লোকটার লড়ুয়ে কঠিন মনের আড়ালে একটা সুন্দর কবি মন রয়েছে।

দিন পনেরো একটানা চলে একটা সুন্দর জায়গায় পৌঁছুলাম আমরা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে কোথাও ইডোরো কিংবা একটু-থেমে-যাও কাঁটা-গুল্মের ঘন ঝোপ, কোথাও সুন্দর মাচাবেল গাছের বিরাট জঙ্গল। গাছে গাছে ঝুলছে হলদে ফল। এই ফল আর গাছের ডালপাতা হাতির খুব প্রিয় খাবার। বনের ধারে হাতির চিহ্ন দেখতে পেলাম। লাদার স্তূপ পড়ে আছে এদিক ওদিক। গাছের ডাল ভাঙা। উপড়ে তোলা হয়েছে কিছু গাছ। খাবার সময় গাছপালা খুব বেশি নষ্ট করে হাতি।

পরের দিন বিকেলে আরেকটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছুলাম। ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা পাহাড়ের পাদদেশে একটা নদী। শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে নদীর বুক। তবে কোথাও কোথাও গভীর গর্তে এখনও পানি আটকে আছে কিছু কিছু। স্ফটিকের মত পরিষ্কার সে পানি। গর্তগুলোর চারধারে নানা জন্তুজানোয়ারের অসংখ্য পায়ের ছাপ। পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে একটা বিশাল পার্কের মত জায়গা চোখে পড়ে। গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে আছে ওখানে চ্যাপ্টামাথা মিমোসা। ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মাচাবেল, বিকেলের আলোয় চকচক করছে মসৃণ পাতা। আর এই দুই ধরনের গাছের ফাঁকে, অবশিষ্ট ভূমি ঢেকে রেখেছে এক ধরনের বেঁটে গুল্ম।

নদীর বুক ধরে চলতে চলতে খাড়াই ঢাল বেয়ে হঠাৎ ওপরের দিকে উঠে গেছে পথ। নদীর ধার ধরে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। নদীর পাড়ে উঠে এলাম আমরা। চোখে পড়ল একদল জিরাফ। নদীর তলায় থাকায় এতক্ষণ দেখতে পাইনি। গুলি করে একটা জিরাফ মারল গুড।

সাঁঝ হয়ে এসেছে। রাত কাটানোর জন্যে ওখানেই থামলাম আমরা। চাঁদের আলোয় বসে জিরাফের মাংসের কাবাব দিয়ে চমৎকার ভোজন হল।

তারপর আগুনের ধারে গোল হয়ে বসলাম আমরা কয়েকজন। চলল ধূমপান। স্যার হেনরি আমার পাশে বসেছেন। সেই পরিবেশে হঠাৎ করেই তাঁর পাশে বড় বেমানান লাগল নিজেকে। সোনালি চুলের বোঝার পাশে খাটো খাটো খাড়া কালচে চুল, সত্যিই বেমানান। তিনি বিশালদেহী, আমি হালকা-পাতলা, ছোটখাট। তাঁর ওজন পনেরো স্টোন, আমার বড়জোর নয়। ক্যাপ্টেন গুড বসেছে আমাদের মুখোমুখি। এই পরিবেশে তাকে আরও বেশি বেমানান লাগছে। পোশাক আর কাঁধের ব্যাজ থাকলে এখনও তাকে আদি অকৃত্রিম ক্যাপ্টেন জন গুড, আর. এন. বলা যেত নিঃসংকোচে।

www.boiRboi.blogspot.com

একটা চামড়ার ব্যাগের ওপর বসে আছে ক্যাপ্টেন। দেখে মনে হয়, কোন সভ্য দেশের সভ্য শহরে নিজের বাড়িতে রয়েছে। এইমাত্র ফিরে এসে শিকারের গল্প শোনাতে বসেছে বন্ধুদেরকে। পরনে বাদামী রঙের টুইডের শিকারি পোশাক, ম্যাচ করে হ্যাট পড়েছে মাথায়। সব কিছুই ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। হাসিখুশি চেহারা। পরিষ্কার কামানো গোঁফদাড়ি। ঠিক জায়গামত বসে আছে আই গ্লাস, দাঁতের পাটি। চাইকি, সাদা গাটাপার্চায় তৈরি একটা কলারও পরেছে।

আমার দৃষ্টির অর্থ ঠিক বুঝতে পারল ক্যাপ্টেন। হেসে বলল, 'সব সময়েই পরিষ্কার থাকতে ভালবাসি আমি। আর এতে তো তেমন খরচ লাগে না। তেমন বোঝাও না, যে বয়ে আনতে কষ্ট হবে।'

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বসে হাসিগল্পে মেতে উঠলাম আমরা। একটু দূরে জড় হয়ে বসেছে কাফ্রিরা। এলাণ্ড হরিণের শিঙে তৈরি পাইপে করে বিষাক্ত দাক্ষা পাতার ধোঁয়া টানছে।

শীত পড়তে লাগল। একজন একজন করে উঠল ওরা। গুটিশুটি মেরে গিয়ে লুকাল কম্বলের তলায়। আরেকটু দূরে একা বসে আছে আমবোপা। হাতের তালুতে চিবুক রেখে গভীর ভাবনায় ডুবে আছে। প্রথম থেকেই খেয়াল করেছি, আর সব কাফ্রিদের কাছ থেকে নিজেকে সব সময় দূরে দূরে রাখে সে।

পরদিন সকালে দেরি করেই ঘুম ভাঙল আমাদের। উঠে পড়লাম। তৈরি হয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। জিরাফের মাংসে নাস্তা সেরে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম শিকারে। সঙ্গে চলল আমবোপা, খিবা আর ভেন্টভোগেল। কুলিরা রইল জিনিসপত্রের পাহারায়।

সঙ্গে তিনটে হাতিমারা রাইফেল নিয়েছি। আর নিয়েছি প্রচুর গোলাবারুদ। আমি আমার বোতলে পানির বদলে ভরে নিয়েছি কমলিকার দেয়া ঠাণ্ডা চা। শিকারের সময় পানির বদলে এই চা খেয়ে বেশি তৃপ্তি পাই আমি।

যেদিক দিয়ে যায়, ধ্বংস করতে করতে যায় হাতি। তার ওপর বিশাল পায়ের ছাপ আর লাদার স্তূপ। চোখ বুজে অনুসরণ করা যায়। শিগগিরই একটা দল চোখে পড়ল। পঁচিশ-তিরিশটা হবে। বেশির ভাগই পরিণত বয়েসী মদ্দা।

ন'টা বেজেছে। ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। রাতের বেলা খেয়েছে হাতিগুলো। পেট ভরা। আমাদের কাছ থেকে শ'দুই গজ দূরে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে এতগুলো দানব এক সঙ্গে! অপূর্ব দৃশ্য!

কয়েকটা শুকনো ঘাসের ডগা তুলে নিয়ে শূন্যে ছেড়ে দিলাম। একটু সামনে সরে এসে মাটিতে পড়ল ডগাগুলো। তার মানে হাতির দিক থেকে আমাদের দিকে বইছে বাতাস। এগিয়ে যাওয়া যায়। আসলে, কাছে থেকে নিশ্চিত হয়ে গুলি করতে চাইছি। গুলি ফসকালে কিংবা শুধু আহত করলে সাংঘাতিক বিপদ হবে।

এগিয়ে গেলাম। চল্লিশ গজের মাঝে এসে গেলাম হাতিগুলোর। এখনও টের পাইনি। ঠিক আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে বিশাল মদ্দা। বড় বড় দাঁত। বাঁয়েরটা স্যার হেনরিকে দেখিয়ে দিলাম। গুডকে বললাম ডানেরটাকে গুলি করতে। আমি বেছে নিলাম মাঝেরটা।

'বুম! বুম! বুম! কান ফাটানো গর্জন করে উঠল তিনটে ভারি রাইফেল। হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়ে দুম্‌ম্ করে আছড়ে পড়ল বাঁ পাশের হাতিটা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাঝেরটা। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে পড়ল আবার। ঘুরে সোজা ছুটে এল আমাদের দিকে। দ্রুত সরে গেলাম একপাশে। পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় আবার গুলি করলাম। হুমড়ি খেয়ে পড়ল হাতিটা। এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় আরও দুটো গুলি করলাম। যন্ত্রণা শেষ হল জানোয়ারটার। ফিরে চাইবার সময় পেলাম এবার।

গুলি খেয়ে ছুটে আসছে তৃতীয় হাতিটা। শুঁড় আকাশের দিকে, ছোটার তালে এদিক ওদিক নড়ছে বিশাল দুই দাঁতের ডগা। জায়গামত গুলি লাগাতে পারেনি

ক্যাপ্টেন। ভেবেছি, আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু না, আমাদেরকে দেখতে পায়নি ওটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেল আমরা যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে।

অন্য হাতিগুলোও ছুটতে শুরু করেছে। হারিয়ে যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। সমস্যায় পড়লাম। আহত হাতিটার পিছু নেব? খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে! ততক্ষণে লাপাত্তা হয়ে যাবে সামনের দলটা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হল। সামনে এগোনোই স্থির করলাম।

ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে হাতির পাল। ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব। এক জায়গায় আবার থেমে না দাঁড়ালে আর ওদের নাগাল পাওয়া যাবে না। তবু চলতে লাগলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ভীষণ বাড়ছে রোদের তেজ। দরদর করে ঘামছি। কিন্তু শিকারের উত্তেজনায় কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে হচ্ছে না। আরও দুই ঘন্টা পর পেলাম ওদেরকে।

গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দলটা। উত্তেজিত। শুঁড় ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। বিপদের গন্ধ খুঁজছে বাতাসে। পুরো দলটা থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক দাঁতালো মদ্দা। পাহারা দিচ্ছে সে। বিন্দুমাত্র বিপদের গন্ধ পেলেই হুঁশিয়ার করে দেবে অন্যদেরকে। আমাদের কাছ থেকে বড়জোর ষাট গজ দূরে। ওটাকেই শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। একসঙ্গে গুলি করলাম তিনজনে। ওখানেই পড়ে গেল হাতিটা। বাকিগুলো আবার ছুটল।

কিন্তু কপাল খারাপ হাতিগুলোর। একশো গজ পরেই একটা নালা। দু'পাশে যেতে পারত, কিন্তু আতঙ্কে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ওগুলোর। সোজা নেমে গেছে নালাটাতে। খাড়া পাড় বেয়ে এখন আর ওপাশে উঠে যেতে পারছে না। এক জায়গায় জটলা করছে। কার আগে কে উঠে যাবে, সেই চেষ্টা করছে কোন কাজ হচ্ছে না, কেবলই হুড়োহুড়ি করছে ওরা। আর গুঁতো মারছে একে অন্যের গায়ে।

নালার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। একনাগাড়ে গুলি চালালাম ফাঁদে পড়া হাতিগুলোর ওপর। গুলি খেয়ে নালার বুকে একটার পর একটা ঢলে পড়তে লাগল হাতি। পাড় বেয়ে উঠে ওপারে যাবার চেষ্টা করল না আর ওরা। নালার দুদিকে খোলা আছে। যে যেদিকে পারে ছুটল পড়িমরি করে। ইচ্ছে করলে পিছু নিতে পারতাম। একেবারে সহজ শিকার। কিন্তু এমনিতেই আটটাকে খতম করেছি। আর রক্তপাত ঘটাতে ইচ্ছে হল না। থামলাম।

নালার বুকে পড়ে আছে পাঁচটা হাতি। দুটোর বুক কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে নিল সঙ্গের কাফ্রিরা। ইতিমধ্যে জিরিয়ে নিয়েছি আমরা তিন শিকারি। আবার রওনা হলাম ক্যাম্পের দিকে। গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেব। এসে কেটে নিয়ে যাবে দাঁতগুলো।

প্রথম তিনটে হাতিকে যেখানে মেরেছিলাম, সেখানে পৌঁছে একদল এলাণ্ডের দেখা পেলাম। গুলি করলাম না। প্রচুর মাংস আছে, খামোকা জীবগুলোকে মেরে লাভ নেই।

আমাদেরকে দেখা মাত্র ছুট লাগাল এলাণ্ডের দল। শ'খানেক গজ গিয়ে ঘন ঝোপঝাড়ের ধারে থামল। একসঙ্গে এত এলাণ্ড এর আগে কখনও দেখেনি গুড। ওগুলোকে কাছ থেকে দেখার শখ চাপল তার। অবশ্য দেখার মতই জীব, এত সুন্দর।

গুডের রাইফেল আমবোপার হাতে। এলাণ্ড মারবে না, শুধু দেখবে, রাইফেল নেবার দরকার নেই। খিবাকে নিয়ে এগিয়ে গেল সে। আমরা বিরক্ত হলাম না। বরং একটু বিশ্রামের সুযোগ মিলে যাওয়ায় ভালই লাগল। একটা গাছের ছায়ায় বসলাম।

পশ্চিমের আকাশ লালে লাল। অস্ত যাচ্ছে বিশাল সূর্য। গাছের সবুজ পাতায় রক্তিম আভা। অপরূপ দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে দেখছি, হঠাৎ হাতির ক্রুদ্ধ চিৎকারে চমকে উঠলাম। ফিরে চেয়ে দেখলাম, আকাশের দিকে শুঁড় তুলে দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে একটা বিশাল হাতি। খুদে লেজটা দিয়ে বাড়ি মারছে নিজের পাছায়। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ভয়াবহ দেখাচ্ছে ধূসর দানবটাকে।

www.boiRboi.blogspot.com

হাতিটার আগে আগে ছুটে আসছে ক্যাপ্টেন গুড আর খিবা। কাঁটা লতায় পা বেঁধে যাচ্ছে। বার বার হোঁচট খাচ্ছে। হুমড়ি খেয়ে পড়লেই হয়, একেবারে পিঠের ওপর উঠে আসবে হাতি।

রাইফেল হাতে করে ছুটলাম। গুলি করতে পারছি না। বেশ দূরে আছে এখনও হাতিটা। ছুটন্ত নিশানায় গুলি লাগাতে পারব না। তাছাড়া গুলির পথেই রয়েছে খিবা আর গুড। ওদের গায়েও লেগে যেতে পারে।

আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই পা পিছলাল গুড। পড়ল হুমড়ি খেয়ে।

জান বাজি রেখে ছুটলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, লাভ হবে না। বড় জোর আর তিন সেকেণ্ড লাগবে হাতিটা আসতে। মারা যেতে বসেছে ক্যাপ্টেন গুড।

ক্যাপ্টেনকে আক্রমণ করতে গিয়েও থেমে গেল হাতিটা। আরেকটা পুঁচকে জীব দাঁড়িয়েছে এসে তার শুঁড়ের কাছে। খিবা। প্রভু অসহায়ভাবে মারা যাবেন, সহ্য করতে পারেনি ছেলেটা। নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে। হাতের আসেগাইটা ছুঁড়ে মারল হাতির মুখে।

আরও খেপে গেল হাতি। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল হতভাগা ছেলেটাকে। শূন্যে তুলে আছাড়া মারল। এক পা তুলে দিল তার নিতম্বে। শুঁড় দিয়ে বুক পিঠ জড়িয়ে ধরে এক টানে ছিঁড়ে দুই টুকরো করে ফেলল।

আমরা পৌঁছে গেছি। সামনে গুলি চালালাম হাতির ওপর। খিবার খণ্ডিত লাশের ওপর ঢলে পড়ল হাতি।

উঠে পড়েছে ক্যাপ্টেন গুড। ছুটে গেল পাগলের মত। মাংসের পাহাড়ের তলা থেকে খণ্ডিত, থেঁতলানো লাশটাকে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল।

দুঃখে, বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছি। পড়ন্ত বেলায় ওই মর্মান্তিক দৃশ্য সইতে পারছি না। যন্ত্রণার একটা দলা যেন উঠে এল বুকের ভেতর থেকে, আটকে গেল গলার কাছে।

স্যার হেনরির দিকে চাইলাম। আমার চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। চোখের পানি গোপন করতে চান হয়ত।

স্তব্ধ হয়ে গেছে ভেন্টভোগেল।

আশ্চর্য! শান্ত রয়েছে শুধু আমবোপা। এগিয়ে গেল সে। বসল মরা হাতিটার পাশে। খিবার মাথাটা বেরিয়ে আছে হাতির তলা থেকে। আধবোজা চোখ দুটোকে গভীর স্নেহে বন্ধ করে দিল আমবোপা। বিড়বিড় করে বলল, 'বীরের মত মরেছ তুমি, খিবা! সত্যিকারের জুলু বীর!'

পাঁচ

খিবার দেহের খণ্ডিত মাংসপিণ্ডগুলো তুলে এনে একটা পরিত্যক্ত পিঁপড়ে-ভালুকের গর্তে কবর দিলাম। পরকালে কাজে লাগতে পারে ভেবে খিবার আসেগাইটাও সঙ্গে দিয়ে দিল আমবোপা।

নয়টা হাতির দাঁত, কাটতে অনেক সময় লেগে গেল। ক্যাম্পের কাছাকাছি বড় দেখে একটা গাছ বেছে নিলাম। অনেক দূর থেকেও চোখে পড়ে গাছটা। ওটার নিচেই দাঁতগুলো সব পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করলাম। গাছটা চিহ্ন রইল। যদি কোনদিন আবার ফিরে আসতে পারি, দাঁতগুলো খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

কাজ শেষ করতে দুদিন লেগে গেল। তারপর আবার রওনা হলাম আমরা।

লম্বা কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে একদিন এসে পৌঁছুলাম লুকাঙ্গা নদীর ধারে, সিটাণ্ডার ক্রালে। এখান থেকেই আসল যাত্রা শুরু হবে আমাদের। জায়গাটা আমার পরিচিত।

ডানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্থানীয় মানুষের বস্তি, তারপরে শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ মাঠ। কাফ্রিদের কিছু গরুমোষ চরছে ওখানে। বাঁয়ে, খানিকদূর গিয়েই তৃণভূমি শেষ। তারপরে হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে মরুভূমি। অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে প্রকৃতির এই হঠাৎ পরিবর্তনের নিশ্চয় কোন ভৌগোলিক ব্যাখ্যা আছে, তবে আমি সেটা জানি না।

একটা সরু জলধারার পাশে ক্যাম্প ফেললাম। আগেরবারও ওখানেই ক্যাম্প ফেলেছিলাম আমি। সামনে, বড়জোর বিশ গজ দূরে রয়েছে সেই পাথরের টিলাটা। যেটার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সিলভেস্ত্রা।

শেষ বিকেল। লাল বিরাট এক বলের মত সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে যেন মরুভূমির বালিতে। আকাশের বিশাল বিস্তারের দিকে দিকে রঙের ছড়াছড়ি, অজস্র রঙের ফানুস উড়িয়ে দিয়েছে যেন কেউ। ক্যাপ্টেনের ওপর ক্যাম্প ফেলার ভার দিয়ে স্যার হেনরিকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম টিলাটার দিকে।

টিলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকালাম সামনের ধূ ধূ শূন্যতার দিকে। বাতাস খুবই পরিষ্কার। অনেক, অনেক দূরে সুলিমান বার্গ, লালচে আকাশের পটভূমিকায় আবছা নীল রেখার মত চোখে পড়ছে। রেখার এখানে ওখানে সাদা ছোপ, তুষার ঢাকা চূড়া ওগুলো।

'ওইই যে,' বললাম, 'সলোমন মাইনসে যাবার বাধা। ওর চূড়ায় কখনও উঠতে পারব কিনা ঈশ্বর জানেন।'

'আমার ভাই হয়ত আছে ওপারে। যদি থাকে, পৌঁছবই আমি ওখানে,' শান্ত, ধীর স্থির গলা স্যার হেনরির।

'তাই যেন হয়,' বলেই ঘুরলাম। ক্যাম্পে ফিরে যাব। আরে, আমবোপাও দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পেছনে! এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের সুলিমান বার্গের দিকে।

আমরা ঘুরতেই হাতের আসেগাই তুলে পর্বতমালার দিকে নির্দেশ করল সে। স্যার হেনরিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানেই যাবেন আপনারা, ইনকুবু?'

ইনকুবু! অবাক হলাম। ওদের ভাষায় ইনকুবু মানে হাতি। রাগও লাগল। একজন শ্বেতাঙ্গকে এভাবে জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে ডাকছে, স্পর্ধা তো কম না! কড়া গলায় জানতে চাইলাম, তার চেয়ে অনেক সম্মানী একজন লোককে এভাবে অপমান করার সাহস সে কোথায় পেল!

হেসে উঠল আমবোপা। আরও রেগে গেলাম আমি। কড়া চোখে চাইলাম ওর দিকে।

'ইনকোসি কি করে জানলেন,' বলল আমবোপা, 'উনি আমার চেয়ে বেশি সম্মানী? ওনাকে দেখেই বোঝা যায় উঁচু বংশের লোক। আমিও তেমন কেউ নই, কি করে জানলেন?'

একজন কাফ্রি একজন শ্বেতাঙ্গর সঙ্গে এভাবে কথা বলছে! অসহ্য লাগছে আমার, কিন্তু আর কিছু বলতে পারলাম না। প্রথম থেকেই আমবোপাকে আর দশজন সাধারণ কাফ্রির মত মনে হয়নি আমার।

আমবোপা কি বলছে, জানতে চাইলেন স্যার হেনরি। বললাম। শুনে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমবোপা, সুলিমান বার্গের ওদিকেই যাচ্ছি আমরা।'

'বিশাল মরুভূমি। পানি নেই। আকাশ ছোঁয়া পর্বতের চূড়া তুষারে ঢাকা। ওর ওপারে, যেখানে সূর্য অস্ত যায়, লোকে জানে না ওখানে কি আছে। ইনকুবু ওখানে কেন যেতে চান?' আমবোপার কথা আবার অনুবাদ করে শোনালাম স্যার হেনরিকে।

'কারণ,' বললেন স্যার হেনরি, 'আমার বিশ্বাস, ওখানে আমার ভাই রয়েছে। ওকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'তাই? তাহলে বছর দুই আগে আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে। এপথেই গেছে সে। সঙ্গে একজন চাকর ছিল, আর একজন শিকারি। আর ফেরেনি

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের কেউ?'

'কি করে জানলে, ও আমার ভাই?'

'লোকটা শ্বেতাঙ্গ। চোখ হুবহু আপনার চোখের মত। দাড়ি অবশ্য কালো। আর স্বাস্থ্য আপনার উল্টো। তার সঙ্গের শিকারিকে চিনি আমি। নাম জিম। বেচুয়ানার লোক।'

'সন্দেহ নেই, ওই শ্বেতাঙ্গই আমার ভাই,' বললেন স্যার হেনরি। 'ছেলেবেলা থেকেই জর্জ অমন। কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলে করে ছাড়ে। পথে কোন দুর্ঘটনায় পরে না থাকলে, ঠিকই সুলিমান বার্গের ওপারে গেছে সে।'

'কিন্তু বড় দুর্গম যাত্রা, ইনকুবু,' মন্তব্য করল আমবোপা।

'দেখ, আমবোপা, মানুষ সত্যি সত্যি চাইলে কোন কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।'

'ইনকুবু ঠিকই বলেছেন,' মাথা দুলিয়ে বলল আমবোপা। 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। জীবনটা ক'দিনের! অন্ধকার থেকে এসেছি, আবার অন্ধকারেই ফিরে যাব। মাঝের সময়টাতে মনে রাখার মত কিছু যদি করেই রেখে যেতে না পারলাম, মানবজন্মই বৃথা!'

'তুমি এক আজব লোক,' বললেন স্যার হেনরি।

হাসল আমবোপা। 'আমার সঙ্গে আপনার অনেক মিল আছে, ইনকুবু। এই যাত্রার উদ্দেশ্যও অনেকটা এক। ওই পাহাড়গুলোর ওপারে ভাইদের খুঁজতে চলেছি আমিও।'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম আমবোপার দিকে। 'মানে? ওই পাহাড়গুলো সম্পর্কে কিছু জান নাকি তুমি?'

'খুব সামান্য। ওপারে আছে এক আজব দেশ। জাদুর দেশ, সাহসী মানুষের দেশ, সুন্দর গাছ আর ঝর্নার দেশ। ওখানে পাহাড়ের মাথা সুন্দর তুষারে ঢাকা! বিশাল এক পথ চলে গেছে, তুষারের মতই সাদা। এ সবই অবশ্য শোনা কথা,' থামল আমবোপা। 'ওসব শোনা কথা শুনিয়ে লাভ নেই। কি আছে না আছে নিজের চোখেই তো দেখতে যাচ্ছি। চলুন যাই। আঁধার নামবে শিগগিরই।'

সন্দেহ গেল না আমার, আরও বাড়ল। ভুরু কুঁচকে তাকালাম আমবোপার দিকে। অনেক বেশি জানে লোকটা!

'আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই, মাকুমাজান,' আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরেছে আমবোপা। 'কুয়া খুঁড়ব না আপনার জন্যে। কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই আমার। যদি কোনদিন ওই পাহাড়গুলো পেরোতে না পারি, জানাব আমি যা যা জানি। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, মৃত্যু অবিরত টহল দিচ্ছে ওখানে। আমার উপদেশ শুনলে, ফিরে যান। হাতি শিকার করুনগে, অনেক সহজ কাজ ওটা।' আর একটাও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। আসেগাইটা কাঁধে ফেলে হাঁটতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে।

আমি আর স্যার হেনরি ফিরে এলাম ক্যাম্পে। অন্যান্য কাফ্রিদের সঙ্গে বসে বন্দুক পরিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমবোপা।

'অদ্ভুত লোক!' বললেন স্যার হেনরি।

'হ্যাঁ,' বললাম। 'ওর ভাবসাব পছন্দ হচ্ছে না আমার। কিছু একটা গোপন করছে সে আমাদের কাছে। বুঝতে পারছি, রাগারাগি করেও কোন লাভ হবে না। মুখ খুলবে না সে। হয়ত মাঝখান থেকে একজন শত্রুই বাড়াব।'

পরের দিন সকালে উঠেই তৈরি হতে লাগলাম আমরা। দুর্গম মরুযাত্রায় পাড়ি জমাব এবার। হাতি মারার ভারি রাইফেল আর গোলাবারুদগুলো বয়ে নেবার আর কোন মানে নেই। পাওনা মিটিয়ে বিদায় করে দিলাম কুলিদের। স্থানীয় এক কাফ্রির সঙ্গে কথা বলে, তার কাছে ভারি বোঝা রেখে যাবার ব্যবস্থা করলাম।

রাইফেলগুলো দেখে লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ। বুঝলাম, একে

বিশ্বাস নেই। চালাকি করতে হল। সবগুলো রাইফেলে গুলি ভরে কক করে রাখলাম। ওকে হুঁশিয়ার করে বললাম, যেন না ছোঁয় ওগুলো। তাহলেই ভয়ানক শব্দে কথা বলে উঠবে রাইফেল। যাকে সামনে পাবে, খুন করে ফেলবে। মালিক ছাড়া আর কাউকে মানে না ওগুলো।

আমার কথা বিশ্বাস করল না লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে একটা রাইফেল তুলে নিল। আমরা কি করে গুলি ছুঁড়ি, দেখেছে সে। বাঁটটা কাঁধে ঠেকিয়ে মাঠের দিকে মুখ করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ শব্দে গর্জে উঠল ভারি এইট-এইট রাইফেল। গুলি গিয়ে লাগল তার একটা গরুর গায়ে। বিশাল গর্ত হয়ে গেল গরুর পাঁজরের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে মরে গেল ওটা। আর বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে পেছনে ছিটকে পড়ল লোকটা। ছেড়ে দিয়েছে রাইফেল।

কাঁধ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল সে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। বড় বড় চোখ না করে চাইল পড়ে থাকা গরুর দিকে। রাইফেলের দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। বুঝলাম, আর চিন্তা নেই। রাইফেলগুলোকে আর ছোঁবেও না সে। তার বাড়ির এক কোণে রাইফেল আর গোলাবারুদ রেখে দিয়ে এলাম আমরা। আমাদের রাইফেলের গুলিতে মরেছে, সহজে যুক্তি দেখিয়ে গরুর দামটা আমাদের কাছ থেকেই আদায় করে নিল সে।

তিনটে ভাল শিকারের ছুরির লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে তিনজন আদিবাসীকে আমাদের সঙ্গে আসতে রাজি করালাম। যাত্রার শুরুতে মাইল বিশেক আমাদের সঙ্গে আসবে ওরা, পানির পাত্র বইবে। প্রতিটি পাত্রে এক গ্যালন মত পানি ধরে।

আমরা কোথায় যাব জানতে চাইল ওরা। বললাম উটপাখি শিকারে চলেছি। আমাদের পাগলামিতে অবাক হল ওরা। তৃষ্ণায় মারা যাব বলে নিরস্ত করতে চাইল। বলে কয়ে হাল ছেড়ে দিল শেষে।

ঠিক করলাম, সাঁঝের পর ঠাণ্ডা পড়লে রওনা হব। সারারাত চলব মরুভূমির ওপর দিয়ে, দিনের বেলা বিশ্রাম নেব।

প্রায় সারাটা দিনই ঘুমিয়ে কাটালাম। সাঁঝের পর তাজা মাংস খেয়ে পেট ভরলাম। সেই সঙ্গে গিললাম প্রচুর চা। আগামী কয়েকদিন পানির কষ্ট যাবে, তাই পানি আর চা খেয়ে পেট ঢোল করে ফেলল গুড। জিনিসপত্র সব বাঁধাছাদা শেষ হল। চাঁদ উঠলে রওনা হব। আবার শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম আমরা।

রাত ন'টায় চাঁদ উঠল। হলুদ আলোয় প্লাবিত করে দিল বুনো এলাকা। সামনের দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো বালিকে এখন সাগরের মত দেখতে লাগছে। সময় হয়েছে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও দ্বিধা করলাম আমরা। নিশ্চিন্ত আবাস ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পা বাড়াতে মানুষের চিরন্তন দ্বিধা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি আমরা তিন ইংরেজ। শঙ্কিত চোখে চেয়ে আছি জ্যোৎস্না ধোয়া বিশাল মরুর দিকে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আমবোপা। কাঁধে আসেগাই। সে-ও চেয়ে আছে মরুর দিকে। তার পেছনে রয়েছে ভেন্টভোগেল আর তিন আদিবাসী—পানির পাত্র বাহক।

'ভাইয়েরা,' ফিরে চেয়ে, ভারি গলায় বক্তৃতা দেবার মত করে বললেন স্যার হেনরি, 'এক অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছি আমরা। পারব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে, বিপদ আসুক বাধা আসুক খারাপ হোক ভাল হোক, শেষ পর্যন্ত দেখব আমরা। আসুন, যাত্রার শুরুতে সেই মহাশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সহায় হন। তাঁর ইচ্ছাই হোক আমাদের ইচ্ছা।' মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিলেন তিনি। দু'হাতে মুখ ঢেকে এক মিনিট নীরব রইলেন। গুড আর আমিও তা-ই করলাম।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরালেন স্যার হেনরি। 'চলুন।'

পা বাড়ালাম আমরা।

পর্বতমালার দিকে সোজা এগিয়ে চলেছি। পথনির্দেশ বলতে তেমন কিছুই নেই,

www.boiRboi.blogspot.com

তিনশো বছর আগে রক্তে লেখা হোসে ডা সিলভেস্ত্রার ম্যাপটা ছাড়া। কতখানি সঠিক ওই ম্যাপ, জানি না, তবু ওর ওপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের। যেখান থেকে যাত্রা করেছি, তার মাইল ষাটেক দূরে পানি আছে, লেখা রয়েছে সিলভেস্ত্রার ম্যাপে। কতখানি সঠিক? তিনশো বছর পরে ছোট্ট ওই ওয়াটার হোল কি এখনও আছে? শুকিয়ে যায়নি? কিংবা মরুভূমির জন্তু-জানোয়ারে নষ্ট, খাবার অযোগ্য করে ফেলেনি তো ওই পানি? ওখানে গিয়ে খাবার পানি না পাওয়া গেলে মরতে হবে। ওই জায়গা থেকে আরও ষাট মাইলের মত দূরে পর্বতমালা। যাক, ভেবে কোন লাভ নেই। যা ঘটার তা ঘটবেই।

নীরব নিস্তব্ধ রাত। বালিতে এখানে ওখানে গজিয়ে আছে কারু লতা, জড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের পায়ে। হাঁটতে বাধা দিচ্ছে। অনবরত জুতোর ভেতর ঢুকে যাচ্ছে বালি। এত বেশি ঢুকছে, হাঁটাই মুশকিল। কয়েক মাইল পর পরই জুতো খুলে ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে বালি।

ঠাণ্ডা রাত। বাতাস অদ্ভুত ঘন আর ভারি। কেমন এক ধরনের স্নিগ্ধ পরশ বোলাচ্ছে চামড়ায়। এই আবহাওয়ায় হাঁটতে বেশ লাগছে, অগ্রগতিও হচ্ছে ভাল।

চলতে চলতে এক সময় শিস দিয়ে উঠল গুড। 'দ্য গার্ল আই লেফট বিহাইণ্ড মী' গানের সুর। নিস্তব্ধ রাতে অনেক বেশি জোরাল শোনাল সে শিস। নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগাতে চুপ করে গেল আবার গুড।

চলেছি একটানা। এর মাঝে একটা হাস্যকর ঘটনা ঘটল। আমাদের সামনে এক জায়গায় ঘুমিয়ে ছিল একদল কোয়াগা, জেব্রার মত ডোরাকাটা মরুবাসী গাধা। কি খেয়াল চাপল গুডের, হয়ত ভাবল কোয়াগা-সওয়ার হয়ে যাবে সুলিমান বার্গে, চুপি চুপি গিয়ে একটা ঘুমন্ত কোয়াগার পিঠে চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জানোয়ারটা। উল্টে বালিতে পড়ে গেল গুড। টপাটপ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অন্য কোয়াগাগুলোও। খুরের ঘায়ে ধুলো উড়িয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের দিকে।

হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে টেনে তুললাম আমরা গুডকে। হাতপায়ের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বিড়বিড় করে কি বলল সে। বোধহয় মানুষ চিনতে পারল না বলে গাল দিল বোকা গাধাগুলোকে।

রাত একটায় প্রথমবার থামলাম আমরা। হিসেব করে পানি খেলাম সামান্য। আধ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার চললাম।

চলতেই লাগলাম। পুবের আকাশে কুমারীর লজ্জারাঙা গালের আভা ফুটল একসময়। সে আভা পরিবর্তিত হল হালকা গোলাপি রঙে। ধীরে ধীরে সোনালি ছোঁয়া লাগল তাতে। ফিনফিনে পাখায় ভর করে নিঃশব্দে উড়ে এল যেন মরুর ভোর। ম্লান হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল অগুণতি তারা। মোমের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল উজ্জ্বল হলুদ চাঁদ। তার কালো পাহাড়ের চূড়াগুলোকে দেখাচ্ছে এখন মুমূর্ষু রোগীর হাড্ডিসার চোয়ালের মত। তারপরই পুব দিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে ছুটে এল সূর্যের আলোর একঝাঁক বর্শা, বালির ওপরে পাতলা পর্দার মত ঝুলে থাকা কুয়াশাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। সোনালি আলো গায়ে মেখে হেসে উঠল একসময় বালির সাগর। মরুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন আরেকটা দিন।

অনেক পথ এগিয়েছি। থামলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু থামলাম না আমরা। আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে আরও খানিকটা এগিয়ে থাকাই ভাল। সূর্য আরও খানিকটা উঠে এলেই চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। জিভ বেরিয়ে যাবে প্রচণ্ড গরমে।

আরও ঘন্টাখানেক চলে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বালির বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বড় বড় পাথর। এগুলোর কাছেই এক জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক পাথরের চাঙড়। মাথাটা বাঁকা হয়ে আধখানা ব্যাঙের ছাতার মত ঝুলে আছে এদিকে। কপাল ভালই বলতে হবে। ওই পাথরের চাঙড়ের আড়ালে আশ্রয় নিলাম আমরা। কয়েক টুকরো বিলটং চিবিয়ে সামান্য পানি দিয়ে গিলে ফেললাম।

তারপর শুয়ে পড়লাম পাথরের ছায়ায়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে দেরি হল না।

চোখ মেললাম বিকেল তিনটেয়। পানি বাহক কুলিরা ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এক পা এগোতে রাজি নয় ওরা, কোন কিছুর বিনিময়েই না। কি আর করব? বোতলের সবটুকু পানি খেয়ে শেষ করলাম। পাত্র থেকে আবার ভরে নিলাম নতুন করে। রওনা হয়ে পড়ল কুলিরা। বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাবে আবার।

সাড়ে চারটে নাগাদ আমরাও রওনা হয়ে পড়লাম। গালে চড় মারছে কড়া রোদ। নীরব একঘেয়ে যাত্রা। যেদিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি। দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছে চোখ। এক জায়গায় কয়েকটা উটপাখির দেখা পেলাম। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখলাম। মরুবাসী একটা বিষাক্ত সাপ আর কয়েকটা গিরগিটি। আমাদেরকে ঘিরে ধরে সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে একধরনের মাছি। ঘ্যান ঘ্যান করছে কানের কাছে, হাতে-মুখের খোলা জায়গায় বসেছে, হাঁটছে, ঢুকে পড়ছে কান আর নাকের ফুঁটোয়। দশটা সরালে বিশটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহা বিরক্তিকর।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল মাছির ঝাঁক। থামলাম আমরা। চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় রইলাম। উঠল। সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে ঝরঝরে তাজা শরীর নিয়ে হাসিমুখে এসে যেন আপন জায়গায় ঠাঁই করে নিল রূপালি চাঁদ।

সারা রাত ধরে হাঁটলাম। মাঝরাতে একবার জিরিয়ে নিয়েছি, রাত দুটোয়। আগের দিনের মতই এল সকাল। থামলাম। বিলটং আর পানি দিয়ে নাস্তা সেরেই শুয়ে পড়লাম। বিশ্রাম দিতে চাই ক্লান্ত শরীরটাকে। সেখানে সেই বালির ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মুখের চামড়া জ্বালা করে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। রোদ চড়ে গেছে, শাণিত ছুরি নিয়ে আমাদের চামড়া ছাড়াবার তোড়জোর করছে যেন সূর্য। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মারার জন্যেই এসে হাজির হয়ে গেছে মাছির ঝাঁক। গরম ওদের কিছু করতে পারে না।

উঠে বসে মাথার ওপরের দিকে থাবা চালালাম। কয়েকটা মাছি ধরা পড়ল হাতের মুঠোয়। পিষে মারলাম ওগুলোকে।

'সহ্য করে নিন,' বললেন স্যার হেনরি। 'কটাকে আর মারবেন!'

'শালার গরম দেখেছ!' রোদের দিকে চেয়ে বলল গুড।

কোথায় আশ্রয় নেয়া যায়! এদিক ওদিক তাকালাম। যতদূর চোখ যায়, কোথাও একটা পাথর চোখে পড়ল না। বড় গাছ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। মাঝেমধ্যে বালির বুকে গজিয়ে আছে কারু লতা। গায়ে গায়ে লেগে থেকে ঝাড় সৃষ্টি করেছে কোথাও। বালির ওপরে শূন্যে এক ধরনের অদ্ভুত উজ্জ্বল ঝিকিমিকি, বাতাস প্রচণ্ড গরম হয়ে ওঠার ফলে ঘটছে এটা।

বসে থাকলে কাবাব হয়ে যেতে হবে। কাজে লেগে গেলাম। ট্রাউল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা বড়সড় গর্ত খুঁড়লাম। লম্বায় বারো ফুট, চওড়ায় দশ আর গভীরতা দুই ফুট। কিছু কারু লতা কেটে নিয়ে এলাম। ঢুকে পড়লাম গর্তের ভেতরে। লম্বা করে শুয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলাম। তার ওপর কারু লতা ভারি করে বিছিয়ে দিয়ে গর্তে নেমে পড়ল ভেন্টভোগেল! জাতে হটেনটট, প্রচণ্ড গরম সইতে পারে। কাজেই আমাদের যখন জিভ বেরিয়ে যাবার জোগাড়, ও তখন নির্বিকার।

মাত্র দুই ফুট গভীর গর্ত। চাদর আর কারু লতা গরম ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। সরাসরি রোদ পড়ছে না গায়ে, এটুকুই রক্ষা। অগভীর কবরের ভেতরে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে কি কষ্ট ভোগ করতে লাগলাম, বলে বোঝাতে পারব না। দিনটা কাটবে কি করে!

বিকেল তিনটে নাগাদ আর সইতে পারলাম না। এভাবে দম বন্ধ করে মরার চেয়ে কাবাব হওয়া অনেক ভাল। বেরিয়ে এলাম। গরম হয়ে গেছে বোতলের পানি। তাই খেলাম দু'ঢোক। বসে থাকলেও রোদে পুড়তে হবে, হাঁটলেও। হাঁটাই ভাল। পথ

www.boiRboi.blogspot.com

এগোবে। উঠে পড়লাম।

পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে এসেছি আমরা ইতিমধ্যেই। আরও প্রায় সত্তর-আশি মাইল দূরে আছে সুলিমান বার্গ। আর হোসে সিলভেস্ত্রার লেখা ঠিক হলে, মাইল দশেকের ভেতরেই রয়েছে ওয়াটার-হোলটা। সত্যিই কি আছে? বোতলের পানি তো ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোদ। তিনটেই মারাত্মক। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পুরো এক ঘন্টা হেঁটে মাইল দেড়েক পথ পেরোলাম। সূর্য ডুবতেই বসে পড়লাম বালির ওপর! চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় রইলাম। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে বালি। খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম বালিতে। সারাদিন অমানুষিক কষ্ট করেছি। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুজে এল চোখ।

চাঁদ উঠলে আমাদের ডেকে তুলল আমবোপা। চলতে লাগলাম আবার। এক সময় হাত তুলে আট মাইল দূরের একটা জিনিস দেখাল সে। সমতল বালিতে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে যেন একটা পিঁপড়ের ঢিবি।

পা আর চলতে চাইছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে রাত দুটোর সময় ঢিবিটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কথা বলার শক্তি নাই কারও, এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বেশি কথা বলা যার স্বভাব, সেই গুড পর্যন্ত একেবারে চুপ হয়ে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে।

পিঁপড়ের ঢিবি নয় ওটা। মরুভূমিতে গজিয়ে ওঠা অদ্ভুত এক ধরনের বালির টিলা। শ'খানেক গজ উঁচু এই টিলাটা। গোড়ার দিকে দু'একর জমি দখল করে আছে।

টিলার গোড়ায় বসলাম আমরা। আমার বোতলে এক পিন্টের মত পানি আছে। অন্যদের বোতলেও তাই। আর পিপাসা সইতে পারছি না আমরা। এক চুমুকে খালি করে ফেললাম যার যার বোতল। কিছুই হল না এতে। তপ্ত বালির বুকে বৃষ্টির ফোঁটা ছ্যাঁৎ করে শুকিয়ে গেল যেন। পিপাসা মিটল না।

আবার শুয়ে পড়লাম।

আপনমনেই বলল আমবোপা, 'পানি না পেলে আগামী চাঁদের মুখ আর দেখতে পাব না!'

না পারলে নাই, মনে মনে বললাম। মরিবাঁচি যা-ই হোক, আগে ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

ছয়

ভোর চারটায় ঘুম ভেঙে গেল। বুকে প্রচণ্ড পিপাসা। সহ্য করতে পারছি না। একটু আগে স্বপ্ন দেখছিলাম—এক শ্যামল অঞ্চলে রয়েছি, গোসল করছি ঠাণ্ডা পানির ঝর্নায়, পান করছি মিষ্টি পানি।

শরীরে পানি নেই। চোখের পাতা লেগে গেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। ঠোঁটের অবস্থাও তাই। খুলতে বেশ বেগ পেতে হল। হাতের তালু, মুখের চামড়া শুকিয়ে চড়চড় করছে। ঠিকই বলেছে আমবোপা। পানি না পেলে আগামী রাত নামার আগেই শেষ হয়ে যাব।

ভোর হল। আর দিনকার মত স্নিগ্ধ ভোর নয়। বাতাস কেমন ভারি, আর ভ্যাপসা গরম। অসহ্য।

আলো ফুটছে। অন্যদের ঘুম ভাঙেনি তখনও। পকেট থেকে বাইবেল বের করলাম, পকেটবুক সংস্করণ। বিড়বিড় করে পড়তে লাগলাম। গলা শুকনো ঠোঁট শুকনো। নিজের স্বর শুনে নিজেই হেসে ফেললাম। হাসিটাও কেমন বিকৃত শোনাল।

একটু জোরেই হেসে ফেলেছি বোধহয়। একে একে ঘুম ভেঙে গেল সঙ্গীদের।

চোখ মেলল। চোখের পাতা মেলতে গিয়ে আমারই মত কষ্ট হল ওদেরও।

পানির সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসলাম আমরা। আলোচনাই সার। কাছেপিঠে না থাকলে কোথায় পাব পানি? খালি বোতলগুলোই আবার বের করলাম। যদি দুয়েক ফোঁটা লেগে থাকে কোথাও? নেই। বোতলের মুখে জিভ লাগিয়ে চুষলাম। সামান্যতম আদ্রতা নেই। একেবারে খটখটে শুকনো।

ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করল গুড। সঙ্গে সঙ্গেই বোতলটা কেড়ে নিলেন স্যার হেনরি। এখন ব্র্যাণ্ডি গেলার মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে তরান্বিত করা। মরুর দিকে চেয়ে বললেন, 'পানি পাই কোথায়!'

'হোসে সিলভেস্ত্রার নির্দেশিত জায়গা তো এটাই,' বললাম। 'এখানেই কোথাও থাকার কথা। কিন্তু কোথায়?'

লক্ষ করছি, আমাদের আলোচনায় কান নেই ভেন্টভোগেলের। নাক উঁচু করে কি যেন শুঁকছে সে। উঠে গিয়ে বালিতে কি যেন খুঁজতে লাগল। খানিক পরেই নিচের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'কি, কি হয়েছে?' বলে উঠে গেল গুড।

আমরাও গেলাম।

গুডের নির্দেশিত দিকে চাইলাম। 'আরে! স্প্রিংবকের খুরের দাগ!'

'এবং পানির কাছ থেকে দূরে যায় না স্প্রিংবক হরিণ,' বলল ভেন্টভোগেল।

'ঠিক,' বললাম। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

কাছেপিঠে পানি আছে, শুধু এই চিন্তাটাই নতুন জীবন এনে দিল যেন আমাদের মাঝে। নাক তুলে আবার বাতাস শুঁকতে শুরু করেছে ভেন্টভোগেল। বলল, 'পানির গন্ধ পাচ্ছি!'

ভেন্টভোগেলের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিলাম না। জানি, সত্যিই বাতাসে পানির গন্ধ পায় হটেনটটরা। কি করে, কে জানে!

ঠিক এই সময় বালির সাগরের ওপার থেকে উঁকি দিল সূর্য। এক অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠল আমাদের চোখের সামনে। ভোরের সূর্যের সোনালি আলো গিয়ে পড়েছে চব্বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরের সেবার স্তনে। জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। স্তনের দু'দিকে কয়েকশো মাইল এগিয়ে গেছে সুলিমান বার্গ। আকাশে পনেরো হাজার ফুটের মত উঠে গেছে দুটো স্তনই। মাঝখানের দূরত্ব বারো মাইল। ছোট ছোট পাহাড় চূড়া ঠেলে বেরিয়ে আছে যেন এই বারো মাইল জায়গায়। প্রায় প্রতিটি চূড়ার মাথায় তুষার, কচি রোদে জ্বলছে।

পর্বতমালার চূড়ায় ভাসছে মেঘ। বেশিক্ষণ সে অপরূপ শোভা দেখতে পারলাম না। শিগগিরই মেঘে ঢেকে ফেলল চূড়াগুলো। দেখতে দেখতে পিপাসার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম, চূড়াগুলো মেঘে ঢেকে ফেলতেই আবার ফিরে এল যেন যন্ত্রণা।

পানির গন্ধ পাচ্ছে বলছে ভেন্টভোগেল, কিন্তু কোথায়? কোনদিকে তো সে সম্ভাবনা দেখছি না! যেদিকে তাকাই, শুধুই উষার রুক্ষ প্রকৃতি। একবিন্দু পানি থাকার জায়গা নেই কোথাও।

'তুমি ভুল করেছ,' আশাহত হওয়ায় রেগে গিয়ে বললাম ভেন্টভোগেলকে। 'কোথায় পানি?'

বাতাসে নাক তুলে শুঁকছেই ভেন্টভোগেল। নাক না নামিয়েই বলল, 'আছে। বাতাসে পানির গন্ধ ভাসছে।'

'হ্যাঁ, ভাসছে,' বললাম। 'ও পানি আছে মেঘে। মাস দুই পরে বৃষ্টি হয়ে নামবে। আমাদের শুকনো হাড় ধুয়ে দেবে।'

টিলার চূড়ার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছেন স্যার হেনরি, দাড়িতে টোকা দিচ্ছেন আস্তে আস্তে। হঠাৎ বললেন, 'পাহাড়টার চূড়ায় নেই তো!'

www.boiRboi.blogspot.com

'ঠিক, ঠিক বলেছেন!' স্যার হেনরির কথা সমর্থন করে চেঁচিয়ে উঠল ভেন্টভোগেল। এগিয়ে গেল টিলাটার দিকে।

'ধুত্তোর!' গজ গজ করতে লাগল গুড। 'পাহাড়ের মাথায় পানি, কে কোথায় শুনেছ?'

'থাকতে পারে,' গুডের হাত ধরে টানলাম। 'চল দেখি!'

টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। কয়েক গজ মাত্র উঠেছি। শোনা গেল ভেন্টভোগেলের চিৎকার, 'পানি! পানি!'

টিলার চূড়াটা হঠাৎ কেটে নিয়েছে যেন কেউ। গভীর চওড়া একটা গর্তে পানি রয়েছে। কালচে পানি। ওখানে পানি এল কোথা থেকে, ভাবার সময় নেই। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লাম পানির ওপর। কুসুম গরম পানি, লবণ আছে, তবে অল্প।

খাওয়া শেষ করে নেমে গেলাম পানিতে। গা ডুবিয়ে বসলাম। শুকনো চামড়াকে ভিজিয়ে দিতে চাই।

পিপাসা মিটতেই মোচড় দিয়ে উঠল পেট। খিদে। খাবার চায় পাকস্থলী। পানি থেকে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে প[illegible] ম বিলটঙের ওপর। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। গত চব্বিশ ঘন্টা পেটে কিছু পড়েনি। শুকনো মাংসে পেট ভরে আবার পানি খেলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম পানির কাছে, ডোবার পাড়ের ছায়ায়।

মিছে কথা লেখেনি হোসে সিলভেস্ত্রা। কিন্তু কথা হল, এমন জায়গায় পানি এল কোথা হতে! তলার জলধারা ফোয়ারার মত উঠে আসে, আফ্রিকায় আরও দেখেছি আমি। তেমনি কোন জলধারা অনবরত ঠেলে উঠে পানি জমা করে রাখছে নিশ্চয় টিলার ওপরের ওই ডোবায়। মৃত সিলভেস্ত্রার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিকেলে উঠলাম ঘুম থেকে। আবার খেলাম বিলটং। রাতে চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় রইলাম। পুবের আকাশে চাঁদ উঁকি দিতেই পেট পুরে পানি খেয়ে নিলাম। ভরে নিলাম [illegible]ার-বটলগুলো। তারপর নেমে এলাম টিলা থেকে।

সে রাতে একটানা পঁচিশ মাইল এগোলাম আমরা। বেশি দূরে নেই সুলিমান বার্গ। আর এক রাত হাঁটলেই হবে। কপাল ভাল। একটা পরিত্যক্ত পিঁপড়ের ঢিবি পেয়ে গেলাম। ওটার ছায়ায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম দিনটা। রাতে চাঁদ উঠলে আবার পথ চললাম। পরের দিন সকালে এসে পৌঁছুলাম সেবার বাম স্তনের পাদদেশে।

মরুভূমির গরম এখানে নেই। রোদের তেজও অনেক কম। ঘন্টা দুই জিরিয়ে নিয়ে স্তনের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। প্রাগৈতিহাসিক কালে আগ্নেয়গিরি ছিল পাহাড়টা, মরে গেছে বহুদিন আগেই।

বেলা এগারোটা নাগাদ ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। পা আর চলে না। কয়েকশো ফুট ওপরে একটুখানি সমতল জায়গা আছে। ওখানে উঠেই বিশ্রাম নেব ঠিক করলাম।

নিচে থেকে ছোট মনে করেছিলাম, উঠে দেখলাম অত ছোট নয় জায়গাটা। সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে। কিন্তু উদ্ভিদগুলো চিনতে পারলাম না। বেশিরভাগই লতা জাতীয় গাছ।

আবার পানি ফুরিয়ে গেছে আমাদের। পিপাসায় ছাতি ফাটছে। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। খাবারও নেই। বিলটং আর গিলতে পারছি না। মুখে দিলেই অরুচিতে পাক দিয়ে উঠছে নাড়ীভুঁড়ি। জোর করে গিললে বমি করে ফেলব।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে হাঁপাতে লাগলাম। বাতাসে নাক তুলে অনেক শুঁকল ভেন্টভোগেল। কিন্তু পানির গন্ধ পেল না।

এভাবে বসে থাকলে চলবে না। উঠে পড়ল আমবোপা। খাবারের খোঁজে চলল। লতাপাতা মাড়িয়ে এগিয়ে গেল। হঠাৎ শোনা গেল তার উত্তেজিত চিৎকার। হাত-পা

তুলে নাচছে সে, চেঁচিয়ে ডাকছে আমাদের।

কি ব্যাপার? ছুটতে ছুটতে গেলাম।

আঙুল তুলে দেখাল আমবোপা। বুনো ক্ষীরা। হাজারে হাজার ফলে আছে। অত ওপরে ক্ষীরা বীজ এল কোথা থেকে? নিশ্চয় পাখির কাজ।

যার কাজই হোক, ভেবে সময় নষ্ট করলাম না। খেতে বসে গেলাম। বড় বড় গোটা কয়েক ক্ষীরা খাবার পর একটু ঠাণ্ডা হল আমার পেট। পিপাসাও নেই আর।

পিপাসা মেটে, পেটও ভরে। কিন্তু তেমন পুষ্টিকর কোন উপাদান নেই ক্ষীরায়। কাজেই গায়ে বল ফিরল না। ঘন্টা দুয়েক পরেই খিদেয় আবার মোচড় দিয়ে উঠল পেট। কি খাওয়া যায়? কোন ধরনের জন্তুজানোয়ারও নেই, যে মেরে খাব। এই সময় হাত তুলে ওগুলো দেখাল ভেন্টভোগেল।

মরুর দিক থেকে উড়ে আসছে একঝাঁক পাখি। বেশ বড় সাইজের। বাস্টার্ড বলে ওগুলোকে। মাংস ভাল। তাড়াতাড়ি একটা উইনচেস্টার রিপিটার তুলে নিলাম।

ফাঁক বজায় রেখে উড়ে আসছে পাখিগুলো। বেশি ওপরে না। পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতেই উঠে দাঁড়ালাম। যা ভেবেছি। আমাকে দেখেই কাছাকাছি হয়ে গেল পাখিগুলো। একে অন্যের ডানায় বাড়ি খাবে যেন। বাস্টার্ডের স্বভাবই ওই। হঠাৎ বিপদ দেখলেই কাছাকাছি হয়ে যায়। সুবিধেই হল আমার। মাথার ওপর দিয়ে ফিরে যাবার সময় গুলি করলাম। পর পর দু'বার। গুলি লাগল একটার গায়ে। ঝুপ করে পড়ল পাখিটা।

পাঁচজন মানুষ, একটা পাখিতে কি হয়? খিদে পেটেই রইল। তবু, তাজা মাংস পেটে পড়ায় আগের চেয়ে একটু সুস্থ বোধ হল। জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত নামল। ঘুম থেকে উঠলাম। খুধার তাড়নায় বিলটংই গিলতে হল আবারও। ক্ষীরা চিপে রস বের করে মুখে ফেললাম। সেই রস দিয়ে কোনমতে গিলে নিলাম কয়েক টুকরো শুকনো মাংস।

চাঁদ উঠল। রওনা হয়ে পড়লাম আমরা।

একটু উঠেই একটা টেবল টপে এসে পড়লাম। চূড়াটা টেবিলের মত সমতল, তাই এই নামকরণ। আফ্রিকার অনেক জায়গায়ই এরকম টেবলটপ পর্বত দেখেছি।

লাভার সমতল টেবিলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। রাত যতই বাড়ছে, ঠাণ্ডা হচ্ছে বাতাস। ভালই আরামে পথ চললাম।

ভোরের দিকে একটা জায়গায় এসে থামলাম। বেশি দূরে নেই আর সেবার বাম স্তনের তুষারে ছাওয়া বোঁটা। বড়জোর বারো মাইলটাক হবে। পানির ভাবনা আর নেই। বারো মাইল গেলেই তুষার পাওয়া যাবে। তাছাড়া এখানেও আশপাশে জন্মে আছে ক্ষীরা-লতা, হাজারো ক্ষীরা ধরে আছে তাতে। রসে টসটস করছে। ভাবনা কেবল খাবারের। কিন্তু কোন জন্তুজানোয়ার চোখে পড়ল না এখানেও। পিপাসায় মরিনি, মনে হচ্ছে খাবারের অভাবেই প্রাণ খোয়াব। সেদিন ২০ মে।

পরদিন ২১ মে। সকাল এগারোটায় রওনা হয়ে পড়লাম। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। দিনের বেলাতে পথ চলতে অসুবিধে নেই। সঙ্গে ক্ষীরা রয়েছে। পানির কষ্ট নেই। কিন্তু পেট জ্বলছে খিদেয়। কোন শিকার মিলল না। ক্লান্ত শরীর। চলার গতি খুবই ধীর। ঘন্টায় মাইলখানেক করেও এগোতে পারলাম না। সাঁঝের বেলা থামলাম। অন্য কষ্ট তো আছেই, শীতেও কষ্ট পেলাম সারাটা রাত।

২২ মে। সূর্য উঠতেই রওনা হয়ে পড়লাম। শরীর সাংঘাতিক দুর্বল। সারাদিনে মাত্র পাঁচ মাইল এগোলাম। ক্ষীরা শেষ। কিছু তুষার গলিয়ে পিপাসা মিটালাম। সমতল এলাকা শেষ হয়েছে। ওপরের দিকে উঠছি। সাঁঝের বেলা ঢালের গায়ে খানিকটা সমতল জায়গায় ক্যাম্প ফেললাম। কয়েক ঢোক করে ব্র্যাণ্ডি পান করলাম সবাই। কম্বলে

www.boiRboi.blogspot.com

গা মুড়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রইলাম। ভয়ানক শীত। সারারাত থরথর করে কাঁপলাম। পেটে খিদে। ঘুম হল না। শেষ রাতের দিকে ভেন্টভোগেলের আর কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবলাম, মরেই গেছে।

২৩ মে। সূর্য উঠতেই উঠে পড়লাম। অসাড় হয়ে গেছে হাত-পা। ঝিঁঝি ধরে গেছে। হাঁটাহাঁটি করতেই স্বাভাবিক হয়ে এল রক্ত চলাচল। খাবার নেই। বোতলে খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে ব্র্যাণ্ডি। ভেন্টভোগেলের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। গরম যেমন সইতে পারে হটেনটট, শীত তেমনি অসহ্য।

দুটো স্তনকে যুক্ত করেছে লাভার উঁচু দেয়াল। ওই দেয়ালের মাথায়ই রয়েছি আমরা। আমাদের পেছনে, অনেক দূরে মরুর বিশাল বিস্তার। সামনে মাইলের পর মাইল বিছিয়ে আছে কঠিন বরফে ঢাকা ঢাল। খুব ধীরে ধীরে উঠে গেছে স্তনের বোঁটা পর্যন্ত। আমরা যেখানে রয়েছি, ওটাকে সমতল ধরলে বোঁটার উচ্চতা প্রায় চার হাজার মাইল। আশপাশে কোথাও একটা জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়ছে না। আকাশে একটা পাখি পর্যন্ত নেই। আমাদের শেষ সময় কি ঘনিয়ে এল!

সারাটা দিন ধরে চলল ওঠার পালা। মাঝে মাঝেই জিরিয়ে নিতে হচ্ছে। বিলটংও নেই আর। বরফ গলিয়ে খেয়ে নিচ্ছে মাঝে মাঝে। পানিও বিস্বাদ লাগছে এখন।

মাইল সাতেক পথ পেরিয়ে সাঁঝের বেলা স্তনের বোঁটার কাছে পৌঁছে গেলাম।

'মনে হচ্ছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গুড, 'কাছেই কোথাও আছে গুহাটা। সিলভেস্ত্রার সেই গুহা।'

'কি জানি!' সন্দেহ প্রকাশ পেল আমার গলায়।

'আরে, মিস্টার,' গোঁ গোঁ করে বললেন স্যার হেনরি, 'সিলভেস্ত্রার লেখায় সন্দেহ করছেন কেন? তার কোন কথা কি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে এখন পর্যন্ত?'

'তা হয়নি। তবে অন্ধকার হওয়ার আগেই গুহাটা খুঁজে বের করে নিতে হবে। নইলে গেছি আমরা। যা শীত! খোলা জায়গায় রাত কাটাতে পারব না। জমে বরফ হয়ে যাব।'

পরের দশটা মিনিট নীরবে খোঁজাখুঁজি চলল। হঠাৎ কথা বলল আমবোপা। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই যে। দেখুন।'

দেখলাম। শ'দুয়েক গজ দূরে বরফের ঢালে একটা কালো বড় গর্ত।

'ওটা গুহামুখ। মুখের চারধারে বরফ জমে আছে,' বলল আমবোপা।

একে একে গুহার ভেতরে ঢুকে গেলাম সবাই। জায়গা আছে। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম আমরা। তবু শীত তাড়াতে পারলাম না। সঙ্গে তাপ মাপার যন্ত্র নেই। অনুমানেই বুঝলাম, শূন্যের নিচে চোদ্দ-পনেরো ডিগ্রি নেমে গেছে উত্তাপ। এখনও জমে যাইনি, এই যথেষ্ট।

পেটে খিদে। তীব্র ঠাণ্ডা আরও তীব্র মনে হল। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে এক অদ্ভুত শব্দ উঠতে লাগল। ঘুমের মাঝে হারিয়ে গিয়ে যন্ত্রণা তাড়াতে চাইলাম। কিন্তু কোথায় ঘুম? প্রচণ্ড ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ঘুম এল না।

আমার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়েছে ভেন্টভোগেল। সারারাত কাঁপুনি টের পেয়েছি তার। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার আওয়াজ শুনেছি। ভোর রাতের দিকে থেমে গেল তার কাঁপুনি। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার শব্দ বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে? ডাকলাম না। ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দেয়ার মানে হয় না।

ভোর হল। গুহামুখে ধূসর আলোর আভাস। প্রথমেই ভেন্টভোগেলের গায়ে হাত রাখলাম। সন্দেহ জাগল। তাড়াতাড়ি কম্বলের তলায় হাত ঢুকিয়ে ওর গা ছুঁলাম। বরফের মত ঠাণ্ডা। গেছে। প্রচণ্ড শীত সইতে না পেরে শেষ হয়ে গেছে লোকটা। অতি ধীরে কম্বলের তলা থেকে বের করে আনলাম হাত।

খাবার না পেলে আমরাও আর বেশিক্ষণ টিকব না। তাই ভেন্টভোগেলের জন্যে

বেশি আফসোস করলাম না।

বাইরে রোদ উঠেছে। গুহামুখ দিয়ে দেয়ালে এসে বিঁধছে আলোর কয়েকটা সোনালি বর্শা। অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে এখন গুহার ভেতরটা।

লম্বায় ফুট বিশেক হবে। শেষ প্রান্তের দিকে নজর পড়তেই আঁতকে উঠলাম। আরেকটা দেহ। শ্বেতাঙ্গ। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মৃত।

ক্ষুধা ক্লান্তি শীতে এমনিতেই অবস্থা কাহিল আমাদের। ওই সংঘাতিক দৃশ্য সইতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি টেনেহিঁচড়ে কোনমতে বের করে আনলাম নিজেদের প্রায় অসাড় দেহগুলোকে।

সাত

গুহার বাইরে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। কেমন বোকা বোকা মনে হল নিজেদেরকে।

'আমি ফিরে যাচ্ছি,' বললেন স্যার হেনরি। 'ওটা...ওটা আমার ভাইয়ের লাশ হতে পারে!'

তাই তো, আগে মনে হয়নি কেন কথাটা! আবার গুহার ভেতরে ঢুকলাম আমরা। চোখে সয়ে এল আধো অন্ধকার, আবার দেখতে পাচ্ছি সবকিছু। লাশটার কাছে এগিয়ে গেলাম। উবু হয়ে বসে লাশের মুখটা দেখলেন স্যার হেনরি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললেন স্যার হেনরি। 'আমার ভাই না।'

বসে পড়ে লাশের মুখটা আমিও দেখলাম। লম্বা একজন মানুষ, মাঝবয়সে মারা গেছে। চোখা চেহারা, মাথায় ঘন চুল আর ঈগলের মত বাঁকানো নাকের নিচে লম্বা কালো এক জোড়া গোঁফ। হাড়ের কাঠামোতে শক্ত হয়ে জড়িয়ে থাকা চামড়ার রঙ ঈষৎ হলদে। নষ্ট হয়ে যাওয়া উলের কম্বলের ওপর পড়ে আছে লাশটা। গলায় জড়ানো রয়েছে একটা চেন, তাতে আটকানো হাতির দাঁতের একটা ক্রুশিফিক্স।

'কে...?' বাধা পেয়ে থেমে গেলাম।

'আরে কে? হোসে ডা সিলভেস্ত্রা,' বলল গুড। 'এছাড়া আর কে হবে?'

'অসম্ভব!' জোর দিয়ে বললাম। 'তিনশো বছর আগে মারা গেছে সিলভেস্ত্রা।'

'তাতে কি হয়েছে?' বলল গুড। 'যা ঠাণ্ডা! এজন্যেই পচন ধরেনি লাশে, ধ্বংস হয়ে যায়নি। এখানেই তাকে ফেলে রেখে গেছে তার চাকর। একা লাশটাকে কবর দিতে পারেনি। ওই যে দেখ,' হাত বাড়িয়ে ছোট সরু হাতের একটা টুকরো তুলে নিল সে। পাথরে ঘসে ঘসে চোখা করে ফেলা হয়েছে হাড়ের এক মাথা। 'এটাই ছিল সিলভেস্ত্রার কলম। লিনেনে লিখেছিল।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ঠিকই বলেছে গুড। ওই যে পড়ে আছে লোকটা, নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ। তিনশো বছর আগে সচল ছিল দেহটা। লিখেছিল কিছু কথা, এঁকেছিল একটা ম্যাপ, যাতে রয়েছে পথনির্দেশ। যে নির্দেশ ধরে ধরে এসে এখানে পৌঁছেছি আমরা। ওই তো, গুডের হাতে সেই কলম, যেটা দিয়ে আঁকা হয়েছিল ম্যাপটা। গলায় জড়িয়ে আছে সেই ক্রুশিফিক্স, যেটাতে শেষবার চুমু খেয়েছিল সে।

'চলুন যাই,' নিচু গলায় ডাকলেন স্যার হেনরি। 'ও, একটু দাঁড়ান। একজন সঙ্গী দিয়ে যাই ওকে।' গিয়ে ভেন্টভোগেলের লাশটা তুলে নিয়ে এলেন তিনি। শুইয়ে দিলেন শুকনো লাশটার পাশে। লাশের গলার ক্রুশিফিক্সটা মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললেন পুরানো চেন। রেখে দিলেন নিজের কাছে। আমি তুলে নিলাম হাড়ের কলমটা।

www.boiRboi.blogspot.com

গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাইরে বেরোতেই স্বাগত জানাল সোনালি রোদ। শীতে, ক্ষুধায় শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন। কিন্তু বসে থাকলে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। ম্যাপের নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে চললাম আবার।

আরও আধ মাইল এগিয়ে মালভূমির ধারে এসে দাঁড়ালাম। সকালের ঘন কুয়াশার জন্যে নিচে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। না দেখে পথ চলা অসম্ভব, থামতেই হল।

রোদ চড়ছে। শিগগিরই কুয়াশার উপরের দিকটা একটু হালকা হল। নিচে, পাঁচশো গজ পর্যন্ত আবছাভাবে চোখে পড়ছে এখন। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পর্বত, প্রথম দিকে তুষারে ঢেকে আছে। তুষারের শেষ প্রান্তে সবুজ ঘাস। ঘাসের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ঝর্না। শুধু তাই না। ঝর্নার ধারে ঘাস খাচ্ছে একদল বড় জাতের অ্যান্টিলোপ হরিণ।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। ওই তো খাবার। কিন্তু ধরতে পারব তো? পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে শিকার। এত দূর থেকে গুলি লাগাতে পারব? কাছে যাবার উপায় নেই। দেখে ফেলবে।

আমার মত একই ভাবনা চলছে স্যার হেনরির মাথায়ও। বললেন, 'এখান থেকেই চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

এক্সপ্রেস রাইফেল তুলে ধরলাম আমি, স্যার হেনরি, আর গুড। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে ইঙ্গিত করলাম আমি। তিনজনে ট্রিগার টিপলাম একসঙ্গে। পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল রাইফেলের গর্জন। কার গুলি লাগল জানি না, তবে পড়ে গেল একটা হরিণ।

আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁচা মাংসই খেতে লাগলাম আমরা। পেট ভরে খেয়ে পান করলাম ঝর্নার বরফ শীতল পানি। পনেরো মিনিটেই অন্য মানুষে পরিণত হলাম আমরা। ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। শক্তি ফিরে এল শরীরে।

'আহ্, বাঁচলাম!' বললেন স্যার হেনরি। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দয়া করে হরিণটা পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।'

বড় হরিণ। অনেক মাংস রয়ে গেছে। কেটে নিতে লাগল আমবোপা। সঙ্গে নেব আমরা।

পেট শান্তি হয়েছে। কুয়াশাও সরে গেছে। চারদিকটা দেখতে লাগলাম আমরা।

আমাদের পাঁচ হাজার ফুট নিচে এক অপরূপ দেশ। বিরাট এক বন। বনের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে রূপালী নদী। বনের বাঁয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল প্রান্তর। তাতে চড়ছে হরিণ আর গরু মোষের পাল। প্রান্তরের পর বিস্তৃত চষা খেত। খেতের ধারে ছোট ছোট কুঁড়ে। সবকিছুকেই ঘিরে আছে পাহাড়-পবর্ত।

চুপচাপ বসে ওই দৃশ্য দেখতে লাগলাম আমরা। একসময় স্যার হেনরি বললেন, 'সলোমনের পথের কথা লেখা আছে না ম্যাপে?'

দূরের গাঁয়ের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই মাথা ঝোঁকালাম আমি।

'দেখুন দেখুন, ওই যে! ডানে!' আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন স্যার হেনরি।

ডানে ফিরে তাকালাম। সত্যিই। বিশাল এক পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে নাক বরাবর, অন্য একটা প্রান্তরের দিকে।

উঠে পড়লাম। মাংস কাটা শেষ হয়েছে আমবোপার। ভাগাভাগি করে ওই মাংস সঙ্গে নিয়ে পা বাড়ালাম আবার।

তুষারে ঢাকা টিলাটক্কর পেরিয়ে আরও মাইলখানেক এগিয়ে আরেকটা পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়ালাম। এর ঠিক নিচে থেকেই রওনা হয়েছে পঞ্চাশ ফুট চওড়া সলোমনের পথ। লাভায় ঢাকা পাহাড়ের গা কেটে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে। ভেবে অবাক লাগল, এখানে, এই পাহাড়ের মাঝে আনা হয়েছিল কেন ওই পথ? সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করলাম ব্যাপারটা নিয়ে।

'আমার মনে হয়,' বলল গুড, 'পথের শুরু এখানে নয়, আরও ভেতরে। কোন কারণে পর্বতের মাঝখান দিয়ে বের করে ওপাশে মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটা ছিল মানুষের তৈরি গিরিপথ। তারপর কোন একদিন অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, ধসে পড়েছিল দু'পাশের পাহাড়। তারপর লাভা জমেছে, তার ওপর জমেছে তুষার। ঢেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে গিরিপথ।

যুক্তি আছে গুডের কথায়। হতেও পারে।

দেরি না করে পাহাড় বেয়ে নেমে এলাম পথের ওপর। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে চললাম। যতই এগোচ্ছি, সরে যাচ্ছি পর্বতের কাছ থেকে। স্নিগ্ধ, উষ্ণ হয়ে আসছে বাতাস। আবহাওয়া চমৎকার।

দুপুরের দিকে একটা বনের কাছাকাছি এসে পড়লাম। বনের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে এখানে পথটা।

'বাহ্, এই তো কাঠের রাজ্যে এসে পড়েছি!' বলল গুড। 'শুকনো কাঠ পাওয়া যাবে। কিছু মাংস রান্না করে খাওয়া দরকার।'

ভাল প্রস্তাব। কোথায় থামা যায়? এদিক ওদিক তাকালাম সবাই।

পথের একপাশে একটু দূরে একটা সরু খাল। পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি বয়ে চলেছে মৃদু কুলুকুলু শব্দে। পথ থেকে নেমে পড়লাম আমরা। খালের পাড়ে এসে থামলাম।

শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে নিয়ে এল আমবোপা। শিগগিরই জ্বালল আগুন। চোখা কাঠিতে মাংসের টুকরো গেঁথে ধরা হল আগুনের ওপর। তৈরি হয়ে গেল কাবাব। বহুদিন পর তাজা মাংসের সুস্বাদু খাবার পেট পুরে খেলাম। উঠে গিয়ে পানি খেয়ে এলাম খাল থেকে। তৃপ্তির ঢেকুর তুললাম সবাই।

চোখ জড়িয়ে আসছে। শুয়ে পড়লাম সবুজ নরম ঘাসের ওপর। কানে আসছে আমবোপা আর স্যার হেনরির কথাবার্তা। ইংরেজির সঙ্গে জুলু ভাষার অদ্ভুত মিশ্রণ, শুনে হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

হঠাৎই খেয়াল হল, আমাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়নি গুড। নেই। গেল কোথায়? উঠে বসে চাইলাম এদিক ওদিক। ওই তো। খালের ধারে। গোসল করতে গেছে।

গুডের গায়ে শুধু শার্ট, নিতম্ব ঢাকা পড়েছে ঝুলের তলায়। প্যান্ট, কোট, ওয়েস্টকোট, সব খুলে ফেলেছে। একটা একটা করে সবগুলোকে ঝাড়ল গুড। করুণ চোখে পরীক্ষা করে দেখল ফাটাছেঁড়াগুলো। সযত্নে ভাঁজ করে খালের শুকনো পাড়ে রেখে দিল কাপড়-চোপড়।

বুট খুলে পানিতে নামল গুড। শুকনো ঘাস দিয়ে আচ্ছা করে ডলে প্রথমে পরিষ্কার করে নিল বুটজোড়া। তারপর উঠে এসে ঘসে ঘসে লাগাল হরিণের চর্বি। কাজ শেষ করে নামিয়ে রাখল বুট।

ছোট একটা ব্যাগ সব সময়ই সঙ্গে বয়ে বেড়ায় সে। ওটা থেকে বের করল ছোট একটা পকেট চিরুণি আর আয়না। নিজের চেহারা দেখল আয়নার ভেতর। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল নিজের দশদিনের গজানো দাড়ি। মুখ বাঁকাল।

আমার মনে হল, শেভ করার কথা ভাবছে গুড।

ঠিকই। জুতোয় লাগানোর পরও খানিকটা চর্বি রয়ে গেছে। ওই টুকরোটা নিয়ে আবার পানিতে নেমে গেল সে। ভাল করে ধুয়ে নিল। পানিতে দাড়ি ভিজিয়ে আচ্ছা করে ঘসে নিল চর্বি দিয়ে। দাড়ির গোড়া নরম করে উঠে এল আবার। ছোট ব্যাগটা থেকে বের করল একটা ছোট ক্ষুর।

দাড়িতে ক্ষুর চালিয়েই গুঙিয়ে উঠল। চর্বি ঘসে কি আর তেমন নরম করা যায় দাড়ি? চড় চড় করে শব্দ উঠল ক্ষুরের আঁচড়ে। দারুণ ব্যথা পাচ্ছে, কিন্তু থামল না ও। চালিয়েই গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

নীরব হাসিতে ফেটে পড়লাম আমি। এত কষ্ট, তবু দাড়ি কামাবেই লোকটা!

ডান জুলফির নিচ থেকে শুরু করেছে সে। কামাতে কামাতে নেমে এসেছে চিবুক পর্যন্ত। এখনও আরও অর্ধেকটা কামানো বাকি। ক্ষুরটা চোখের সামনে এনে ভয়ে ভয়ে চাইল। কামানো গালে হাত বুলিয়েই হাসি ফুটল মুখে। বাম গাল কামানোর জন্যে সবে ক্ষুর ধরেছে, সরু লম্বা কিছু একটা ঝিক করে উঠতে দেখলাম ওর মাথার ওপর। উড়ে চলে গেল জিনিসটা।

আঁতকে উঠল গুড। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কি হল! উঠে দাঁড়ালাম। ফিরে চেয়ে দেখলাম, আমাদের কাছ থেকে বিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গুডের কাছ থেকে দশ কদম দূরে।

একদল মানুষ। হাতে বর্শা। চামড়ার রঙ তামাটে। খাটো আলখেল্লার মত করে গায়ে জড়ানো চিতার চামড়া। মাথায় পাখির পালক গোঁজা। দলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। বয়েস সতেরো-আঠারো। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সোজা হচ্ছে ধীরে ধীরে। ডান হাতটা এখনও সামনে বাড়ানো। বর্শা ছুঁড়ে মারার পর এখনও পুরোপুরি সোজা হয়ে সারেনি।

বয়স্ক, সৈনিকগোছের একজন লোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। হাত চেপে ধরে কি যেন বলল যুবককে। তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল দলটা।

খালের পাড় থেকে ইতিমধ্যেই সরে এসেছে গুড। আমবোপা আর স্যার হেনরির দেখাদেখি সে-ও রাইফেল তুলে নিয়েছে। কিন্তু খেয়ালই করল না জংলিরা। একই ভাবে এগিয়ে আসছে।

আমার মনে হল, রাইফেল চেনে না ওই জংলিরা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি জংলিদের দিকে।

কোন্ ভাষায় কথা বলে ওরা, জানি না। জুলু ভাষায় বললাম, 'স্বাগতম।'

'স্বাগতম।' আমাকে অবাক করল বুড়ো যোদ্ধা। জুলু ভাষায়ই কথা বলে ওরা, তবে একটু টেনে টেনে।

আরও এগিয়ে গেলাম।

'কে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো। কোত্থেকে এসেছ? তোমাদের চামড়া সাদা, অথচ ওই লোকটা আমাদের মত কেন?' আমবোপাকে দেখিয়ে জানতে চাইল বুড়ো।

আরে, তাই তো! আমবোপা একেবারেই ওদের মত দেখতে! বললাম, 'আমরা বিদেশী। ওই লোকটা আমাদের চাকর।'

'বিদেশী? তাহলে মরতে হবে তোমাদের,' বলল বুড়ো। 'আমাদের কুকুয়ানা রাজ্যে কোন বিদেশী ঢুকে পড়লে তাকে মরতে হয়। এটাই রাজার আইন।'

বর্শা তুলে ধরল জংলিরা। আঁতকে উঠলাম। এতখানি পথ এসে শেষে এভাবে মরতে হবে?

'কি বলছে, ব্যাটা?' জানতে চাইল গুড।

'আমাদের খুন করবে,' জানালাম।

'ও লর্ড!' গুঙিয়ে উঠল গুড। একটা মুদ্রাদোষ আছে তার। কোন কঠিন সমস্যায় পড়লেই ওপরের পাটির সামনের দাঁতে আঙুল দিয়ে টান মারে। এখনও তাই করল। একটু জোরেই টান মেরে বসল। খুলে চলে এল পাটিটা। আঙুল দিয়ে আবার ঠেলে দিল সে। মুখ বন্ধ করে ফেলল। খট করে আবার বসে গেল দাঁতের পাটি।

গুডের এই মুদ্রাদোষই বাঁচিয়ে দিল আমাদেরকে।

আতঙ্কিত চোখে ব্যাপারটা ঘটতে দেখল জংলিরা। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে ছুটে সরে গেল কয়েক গজ। ফিরে চাইল।

'ওর দাঁত,' উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে বললেন স্যার হেনরি! দাঁত বের করতে দেখেই ভয় পেয়েছে জংলিরা। গুড, জলদি লুকিয়ে ফেল দাঁতের পাটি!'

জংলিদের অগোচরে দু'পাটি দাঁত খুলে খুলে মুঠোয় নিয়ে লুকিয়ে ফেলল গুড।

এক পা এক পা করে আবার এগিয়ে এল জংলিরা। ভয়ও পাচ্ছে, কৌতূহলও হচ্ছে।

'হে আজব মানুষেরা,' বলল বুড়ো। আঙুল তুলে গুডকে দেখিয়ে বলল, 'এই মানুষটি···এর গায়ে কাপড় কিন্তু পা খালি, মুখের এক পাশে দাড়ি, আরেক পাশে নেই, অনেক বড় একটা চোখ চকচক করছে, ইচ্ছেমত দাঁত খুলতে বন্ধ করতে পারে···ও কেমন মানুষ?'

'মুখ খোল তো, গুড,' বললাম। 'দেখাও ওদের।'

লাল মাড়ি বের করে জংলিদের দিকে চেয়ে হাসল গুড।

আতঙ্কে আবার অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কুকুয়ানারা। দু'চারজন পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'ওর দাঁত কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'একটু আগে ছিল। নিজের চোখে দেখেছি!'

জংলিদের দিকে পেছন করে দাঁড়াল গুড। দু'হাত আবার তুলে আনল মুখের ওপর। লাগিয়ে নিল দাঁতের পাটি। ঘুরে আবার হাসল গুড, এবার দাঁত বের করে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল যুবক। গুডের দিকে বর্শা ছুঁড়েছিল সে-ই। অন্য জংলিরাও ভয়ে কাঁপছে। স্থির হয়ে থাকতে পারছে না বুড়ো। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে তার।

'ভূত! ভূত!' কাঁপতে কাঁপতে গুডকে বলল বুড়ো। 'মেয়েমানুষের পেটে এমন মানুষ জন্মে না, যার এক গালে দাড়ি থাকে, অন্য গাল খালি, যার একটা বিশাল চকচকে চোখ থাকে, যে ইচ্ছেমত নিজের দাঁত গলাতে পারে, বানাতে পারে! আমাদের···আমাদেরকে মাপ করুন, হে মালিক!'

সুযোগটা নষ্ট করলাম না। 'আমাদের ক্ষমতা না জেনে খারাপ ব্যবহার করেছ। ঠিক আছে, প্রথমবার মাফ করে দিলাম,' গলাটাকে ভারি করে তুলে বললাম, 'এখন তো জানলে। আর কক্ষণো বেয়াদবি করবে না। জান কোত্থেকে এসেছি আমরা?' আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললাম, 'তারার দেশ থেকে। ওই যে, সব চেয়ে বড় যে তারাটা জ্বলজ্বল করে রাতের বেলা, ওখানেই বাড়ি আমাদের।'

'আরিব্বাপরে! তাই নাকি!' সমস্বরে গুঙিয়ে উঠল কুকুয়ানারা।

'কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে বাস করতে এসেছি,' বললাম। 'সঙ্গ দিয়ে ধন্য করতে এসেছি তোমাদের। তোমাদের ভাষায় কথা বলছি। বুঝতে পারছ না, ভাষাটা শিখে জেনেশুনেই এসেছি আমরা।'

'আরে তাই তো! তাই তো!' আবার উঠল সম্মিলিত চিৎকার।

'তবে, মালিক,' বলল বুড়ো, 'খুব ভালমত শিখতে পারেননি। কাঁচা রয়ে গেছে অনেক।'

কড়া চোখে তাকালাম বুড়োর দিকে। দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল সে।

'খুব তাড়াতাড়ি শিখতে হয়েছে,' শীতল গলায় বললাম। 'তো, বাবারা, এখন একটা কথা বলি। ওই ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ও বর্শা ছুঁড়েছিল।' যুবককে দেখালাম আঙুল তুলে।

আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটা। যেন বর্শা বিঁধিয়ে দেয়া হয়েছে তার বুকে।

'ওকে, ওকে ছেড়ে দিন, মালিক,' কেঁদে ফেলবে যেন বুড়ো। 'মাপ করে দিন। ও আমার ভাতিজা। রাজার ছেলে। আর কখনও আপনাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না। আমি কথা দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বাবা, আর কখনও করব না,' বলল যুবক।

www.boiRboi.blogspot.com

'বেশ,' বললাম। 'কিন্তু এখনও তোমাদের মাঝে অনেক আছ, যারা আমাদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করছ না। বুঝতে পারছ না, কতখানি ভয়ঙ্কর আমরা।' আমবোপার দিকে ফিরে তুড়ি বাজালাম। 'এই, কুত্তা কাঁহিকা, গোলামের বাচ্চা গোলাম, আমার কথা-বলা জাদুর লাঠিটা দে তো।' বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখালাম একটা রাইফেল।

রাইফেল তুলে নিয়ে এগিয়ে এল আমবোপা। মাথা নুইয়ে দীর্ঘ কুর্নিশ করে বাড়িয়ে দিল ওটা, 'এই যে নিন, মালিকের মালিক।'

আমবোপাকে রাইফেল দিতে বলার আগেই লক্ষ করেছি, সত্তর গজ দূরে পাথরের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্লিপস্প্রিঙ্গার অ্যান্টিলোপ হরিণ। ছোট্ট নিশানা। লাগানো কঠিন। তবু ঝুঁকিটা নেব, ঠিক করলাম।

'ওই যে, দেখ,' বুড়োকে হরিণটা দেখিয়ে বললাম, 'একশো কদম দূরে, ওটা কি দেখছ?'

'একটা হরিণ, মালিক,' বলল বুড়ো। 'আমার যোদ্ধাদেরকে বলব মেরে এনে দিতে?'

'কোন দরকার নেই,' বললাম। 'বল তো, মেয়েমানুষের পেটে জন্মালে কোন মানুষ বজ্রের শব্দ করে এখান থেকে হরিণটাকে মেরে ফেলতে পারবে কি না?'

'না, মালিক, তা পারবে না,' জবাব দিল বুড়ো।

'কিন্তু আমি পারব,' শান্ত কণ্ঠে বললাম।

'না, মালিকও পারবেন না,' অবিশ্বাসের হাসি হেসে এপাশ ওপাশ মাথা দোলাল সে।

নিঃশব্দে রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা করলাম। মিস করা চলবে না। শ্বাস বন্ধ রেখে আস্তে করে টান দিলাম ট্রিগারে। পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে হরিণটা।

গর্জে উঠল রাইফেল। লাফ দিল হরিণ। পরক্ষণেই এসে পড়ল আবার পাথরের ওপর। পড়েই রইল। আতঙ্কিত গুঞ্জন উঠল জংলিদের মাঝে।

'মাংস চাই?' কুকুয়ানাদের দিকে চেয়ে বললাম। 'যাও, নিয়ে এস হরিণটা।'

দলের দিকে ফিরে ইশারা করল বুড়ো। একজন লোক ছুটল হরিণ আনতে।

কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে এল। দড়াম করে ফেলল ঘাসের ওপর।

সবাই ঘিরে ধরল মরা জন্তুটাকে। অবাক হয়ে দেখছে, কাঁধের গোল ছিদ্র দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'দেখলে তো?' জংলিদের বললাম। 'ফালতু কথা বলি না আমরা। আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও যদি কারও সন্দেহ থাকে, ওই পাথরের স্তূপের ওপর গিয়ে দাঁড়াও। একবার মাত্র বজ্রের শব্দ করব। ওই হরিণের মত দশা হবে তার। কে যাবে?'

হাত আকাশের দিকে তুলে দ্রুত পিছিয়ে গেল জংলিরা।

'দয়া করুন, মালিক, দয়া করুন!' চেঁচিয়ে বলল এক জংলি। 'আমাদের গান্ধা শরীরে জাদুর ক্ষমতা নষ্ট করবেন না!'

'আমাদের সব জাদুকর মিলেও এখন কেরামতি দেখাতে পারবে না,' বলল আরেকজন।

'ঠিক কথা,' স্বীকার করল বুড়ো। 'হে তারার সন্তানেরা, এই অধমের নাম ইনফাডুস, কাফার ছেলে। এক সময় কুকুয়ানার রাজা ছিল কাফা।' যুবককে দেখিয়ে বলল, 'আর এর নাম ক্র্যাগা।'

'আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমাকে খতম করে, ব্যাটা ক্র্যাগার বাচ্চা!' ইংরেজিতে বিড়বিড় করে বলল গুড।

'ক্র্যাগা, টুয়ালার ছেলে,' আবার বলল বুড়ো। 'মহান রাজা টুয়ালা, হাজার স্ত্রীর স্বামী, কুকুয়ানার মনিব, মহান পথের রক্ষক, শত্রুদের আতঙ্ক, কালো জাদুর ছাত্র, লাখো

যোদ্ধার সেনাপতি। একচোখা, কালো-আতঙ্ক, ভয়াবহ টুয়ালা!'

'টুয়ালার কাছেই নিয়ে চল আমাদেরকে,' দাম্ভিক গলায় বললাম। 'বাচ্চা খোকা, আর চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকবক করে কোন লাভ নেই।'

'হ্যাঁ, মালিক, তাঁর কাছেই নিয়ে যাব,' বলল বুড়ো। 'টুয়ালার কাছে নিয়ে যাব। আপনাদের মহাজাদু দেখবেন তিনি। তবে পথ অনেক লম্বা। তিনদিন হল শিকারে বেরিয়েছি আমরা। এখান থেকে তিন দিনের পথ রাজা টুয়ালার বাড়ি।'

'হোক। যাব,' বললাম। 'পথ দেখাও। কিন্তু সাবধান, ইনফাডুস! সাবধান স্ক্র্যাগা! কোনরকম চালাকির চেষ্টা কোরো না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠবে জাদুর লাঠি। ছেদা করে দেবে তোমাদের শরীর।'

'না না মনিব, চালাকি করব না,' তাড়াতাড়ি বলল ইনফাডুস। মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল। সোজা হয়ে বলল, 'মালিকদেরকে পথ দেখিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাব আমরা।'

ঘুরে নিজের লোকদেরকে নির্দেশ দিল ইনফাডুস।

এগিয়ে এল কয়েকজন জুলু। আমাদের জিনিসপত্র হাতে হাতে তুলে নিল। রাইফেলগুলো দিলাম না, ওগুলো আমাদের হাতে রইল।

খালের পাড়েই কাপড় ফেলে রেখে চলে এসেছে গুড। একজন গিয়ে নিয়ে এল ওগুলো। ছোঁ মেরে কাপড়গুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল গুড। পারল না। শক্ত করে ধরে রেখেছে লোকটা। মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে গুডের উরুর দিকে।

'এই ব্যাটা, আমার কাপড় দে!' ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল গুড।

অনুবাদ করে জংলি লোকটাকে শোনাল আমবোপা।

'আমার চকচকে চোখে মালিককে বল,' অনুরোধ জানাল ইনফাডুস, 'কাপড়গুলো যেন না নেন। তাঁর গোলামেরাই বয়ে নিতে পারবে ওগুলো! তাছাড়া কাপড় পরার দরকার কি? কি সুন্দর তাঁর ওই সাদা পা! দেখে ধন্য হচ্ছি আমরা। গোলামদের নিরাশ করতে মানা কর তাঁকে।'

হা-হা করে হেসে উঠেছিলাম আরেকটু হলেই।

'ধুত্তোর!' আমবোপা কিছু বলার আগেই গর্জে উঠল গুড। 'কালো হারামজাদা আমার প্যান্টও দেয় না, আবার ফড়ফড় করে কি বলে!'

'শোন, গুড,' হাসি চাপতে চাপতে বললাম, 'ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে রেখেছি। বলেছি, তারার দেশ থেকে এসেছি আমরা। ওরাও বিশ্বাস করেছে। ওরা তোমাকে এক মহাক্ষমতাশালী জাদুকর ধরে নিয়েছে। তোমার ওই চমৎকার সাদা পা দেখে ধন্য হতে চাইছে। আপাতত প্যান্ট পর না। ওদের নিরাশ করা উচিত হবে না।' কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল গুড, বাধা দিয়ে বললাম,' আর শুধু তাই না, এখন থেকে মুখের একপাশের দাড়ি কামিয়ে রাখবে। অন্য পাশের দাড়ি থাকবে। তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখে দুঃখই লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। বাঁচতে হলে, যা বলছি কর। ঘুণাক্ষরেও যেন ওরা বুঝতে না পারে জাদুর জ-ও জানি না আমরা।'

'যা বলছ, সত্যি সত্যি করতে হবে আমাকে?' হতাশ গলায় বলল গুড।

'এছাড়া উপায় নেই। তোমার দাঁতের পাটি, তোমার সাদা উরু আর চকচকে আইগ্লাসই এখন আমাদের ভরসা। কপাল ভাল তোমার, এখানে শীত নেই। গায়ে কাপড় না থাকলেও কষ্ট পাবে না। শার্টটা খুলে রাখনি, এই যথেষ্ট। তাহলে কাম সেরেছিল!' কি হত, ভাবতেই আবার পেট ফেটে যাবার জোগাড় হল আমার। মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি রোধ করলাম।

'হায় ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠল গুড। 'এই ছিল তোমার মনে!'

www.boiRboi.blogspot.com

স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

আট

উত্তর-পশ্চিম মুখো হয়ে এগিয়ে গেছে চওড়া, বিশাল পথ। সারাটা বিকেল সেই পথ ধরে হাঁটলাম আমরা।

আমাদের পাশে পাশেই রয়েছে ইনফাডুস। ওই পথ কে তৈরি করেছে, কখন করেছে, জানে কিনা জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। 'কেউ জানে না, মালিক। গন্ধ শুঁকে ডাইনী খুঁজে বের করে যে, যার বয়েসের কোন গাছপাথর নেই, সেই গাগুলও জানে না।'

'এই দেশে কবে এসেছিল কুকুয়ানারা?'

'যতদূর জানি, মালিক, দশ হাজার চাঁদ আগে। ওদিকে, অনেক অনেক দূরের এক দেশ থেকে,' আঙুল তুলে উত্তর দিক দেখাল ইনফাডুস। 'এখানেও থামত না তারা। আটকে দিয়েছে পাহাড়। কে জানে, হয়ত পাহাড়ও ডিঙোত তারা! জায়গাটা ভাল, প্রচুর শিকার আছে, চাষের জমি আছে, তাই থেকে গিয়েছে। মহাশক্তিশালী এক জাত এখন কুকুয়ানারা। অনেক যোদ্ধা আছে। যোদ্ধাদের বেশির ভাগই যোগ দিয়েছে রাজা টুয়ালার সেনাবাহিনীতে।'

'কত লোক আছে টুয়ালার সেনাবাহিনীতে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'অনেক। রাজার আদেশে মাঝে মাঝে এক জায়গায় জড় হয় ওরা। তখন যেদিকেই চাইবেন, শুধু ওদের মাথায় পরা পালক চোখে পড়বে।'

'অত যোদ্ধা! প্রায়ই লড়াই বাধে বুঝি?'

'না। লড়াই মাত্র একবার হয়েছে। তা-ও আসল লড়াই নয়, নিজেদের মাঝে মারামারি।'

'কেন?'

'রাজা কাফার ছিল তিন ছেলে। এক রানীর পেট থেকে এসেছে ইমোটু আর টুয়ালা, দুই যমজ ভাই। আমি তাদের আরেক ভাই, তবে আমার মা আলাদা। আমাদের সমাজের নিয়ম, যমজ সন্তান হলে দুর্বলটিকে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু টুয়ালার মা তাকে মারতে দেয়নি। লুকিয়ে ফেলেছিল।'

'আচ্ছা?'

'যখন কাফা, মানে বাবা মারা গেল, রাজা হল ইমোটু। এই সময় নতুন রাজার এক ছেলে হল। ছেলের নাম রাখা হল ইগনোসি। ছেলের বয়স যখন তিন, বাধল গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে আহত হল ইমোটু। সুযোগ বুঝে টুয়ালাকে রাজ্যে নিয়ে এল ডাইনী গাগুল। এতদিন তাকে পাহাড়ের এক গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল ভয়ানক ডাইনীটা। আমাদের দেশে রাজার শুধু বড় ছেলের গায়ে সাপের চিহ্ন এঁকে দেয়া হয়। অথচ টুয়ালার শরীরেও সেই চিহ্ন এঁকে দিল গাগুল। লোকের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে আদেশ করল, 'তোমাদের রাজাকে সালাম জানাও। এই দিনটির জন্যেই ওকে এতদিন গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

'ইমোটুর পক্ষে কথা বলল না কেউ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'গাগুলকে সবাই ভয় পায়, মালিক। তার কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস কারও নেই। চেঁচিয়ে রাজাকে সালাম জানাল সবাই।'

'তারপর?'

'চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহত ইমোটু। বলল, 'এত চেঁচামেচি কিসের? কোন্ রাজাকে সালাম জানাচ্ছ? আমি তোমাদের রাজা! আসেগাই হাতে ছুটে

গেল টুয়ালা। ভাইয়ের চুল ধরে টেনে শুইয়ে ফেলল। তার হৃৎপিণ্ড ছেদা করে দিল। তারপর লোকের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, আমি রাজা! তোমাদের রাজা! সব লোক মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল তাকে। হাততালি দিয়ে রাজার জয় ঘোষণা করল। তারপর থেকেই কুকুয়ানাদের রাজা হয়ে আছে টুয়ালা।'

'ইমোটুর স্ত্রী কি হল?' জানতে চাইলাম। 'আর তার ছেলে ইগনোসি? ওদেরকে কি মেরে ফেলেছে টুয়ালা?'

'না, মালিক। বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্বামীকে খুন হতে দেখল ইমোটুর বৌ। দেরি করল না। ছেলেকে তুলে নিয়েই পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। দু'দিন হেঁটে এক বস্তিতে গিয়ে উঠল সে। ক্ষুধায় কাহিল। কিন্তু টুয়ালার ভয়ে কেউ তাকে খাবার দিল না। বস্তির বাইরে খোলা জায়গায় পড়ে রইল ইমোটুর বৌ। একটি ছোট মেয়ের খুব মায়া হল। রাত নামলে, অন্ধকারে লুকিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এল সে। খেয়ে জান বাঁচাল ইমোটুর বৌয়ের। মেয়েটিকে দোয়া করল সে। রাতের বেলায়ই আবার রওনা হয়ে পড়ল। ছেলেকে কোলে নিয়ে সোজা চলে গেল পর্বতের দিকে। এরপর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি ওদের। ওখানে নিশ্চয় না খেতে পেয়ে মারা গেছে সে। কিংবা জন্তু জানোয়ারে খেয়ে ফেলেছে মা-ছেলেকে।

'তারমানে, ইমোটু মারা গেলে আসলে রাজা হবার কথা ছিল ইগনোসির? কুকুয়ানাদের নিয়মে তাই তো বলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, মালিক ইগনোসির গায়ে সাপের চিহ্ন আঁকা আছে। জন্মের পর পরই আঁকা হয়েছিল। ইমোটুর মৃত্যুর পর তারই রাজা হবার কথা। কিন্তু সে তো বেঁচে নেই!'

ঠিক এই সময় পেছনে ফিরে গুডের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ধাক্কা খেলাম আমবোপার গায়ে। একেবারে আমার গা ঘেঁষে আছে সে। ইনফাডুসের সঙ্গে আমার কথাবার্তা গভীর আগ্রহে শুনছে। ওর মুখের ভাবসাব দেখে অবাকই লাগল। মনে হল, কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। বহুদিন আগের কোন ঘটনার কথা!

আরও দু'দিন সলোমনের পথ ধরে হাঁটলাম আমরা। কুকুয়ানা রাজ্যের অন্তর ভেদ করে এখন এগিয়ে গেছে পথ।

দ্বিতীয় দিন সাঁঝের আগে একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম আমরা। আশপাশের চেয়ে জায়গাটা উঁচু। সামনে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এটাই রাজধানী লু, টুয়ালা রাজার আবাসভূমি। বিরাট এলাকা, ঘের পাঁচ মাইলের কম হবে না। উত্তরে মাইল দুয়েক দূরে বিশাল বাথান, তারপরে একটা পাহাড়। অদ্ভুত। দেখতে অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। পাহাড়ের পরে ষাট সত্তর মাইল বিস্তৃত সমভূমি। শেষ হয়েছে তুষার ছাওয়া বিশাল পর্বতমালার পাদদেশে।

আরও ঘন্টাখানেক হেঁটে রাজধানীর সীমানা পেরোলাম আমরা। মরুভূমির এখানে ওখানে আগুন জ্বলছে। হাজার হাজার শিবির ফেলা হয়েছে। ওই সব শিবিরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। আরও আধঘন্টা হেঁটে সারি সারি কুঁড়ের কাছে চলে এলাম আমরা। অনেকগুলো কুঁড়ে পেরিয়ে একটা বড় কুঁড়ের সামনে এসে পৌঁছুলাম। থামতে বলল ইনফাডুস। জানাল, এই কুঁড়েতেই থাকতে হবে আমাদের।

ঢুকলাম। মাটিতে কয়েকটা বিছানা। পুরু করে ঘাস ফেলে তার ওপর শুকনো চামড়ার চাদর বিছানো। আরাম করে হাত ছড়িয়ে বসলাম ওই বিছানায়।

মেহমানদারির ত্রুটি করল না ইনফাডুস। বাইরে গামলায় পানি দেয়া হল। আমাদেরকে হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বলল।

ধুয়ে এসে দেখলাম, খাবার তৈরি। নিয়ে এসেছে কয়েকটা মেয়ে। কাঠের বড় রেকাবিতে রয়েছে ষাঁড়ের ভাজা মাংস আর ভুট্টা সেদ্ধ। মাটির বিশাল পাত্রে করে এনেছে গরুর দুধ। আরেকটা পাত্রে মধু। দীর্ঘদিন আজেবাজে খাবার খেতে হয়েছে। তাই ওগুলোকে বেশ রাজসিক বলেই মনে হল। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

পথশ্রমে ক্লান্ত আমরা। খিদে মিটতেই চোখ জুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ্যের ঘুম। বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে এসে নাস্তা সারলাম। এই সময় খবর এল রাজার কাছ থেকে, আমাদের দেখতে চায়, যেতে বলেছে।

রাজদর্শনে যাব। হুট করে গেলেই তো আর হবে না। তৈরি হতে লাগলাম। ময়লা কাপড়জামায় লেগে থাকা ধুলোবালি ঝাড়লাম। কিন্তু পরিষ্কার কি আর হয়? যাই হোক, করার কিছু নেই। কাপড়-চোপড় আর নেই সঙ্গে। এগুলো পরেই যেতে হবে।

রাজার সামনে খালি হাতে যাই কি করে? কিছু উপহার নেয়া দরকার। হতভাগ্য ভেন্টভোগেলের উইনচেস্টার রাইফেলটা নিলাম। কিছু গুলিও নিলাম ওটার জন্যে। রাজাকে দেব। রানীদের খুশি করার জন্যে নিলাম রঙিন পুঁতির মালা।

তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলাম কুঁড়ে থেকে। দরজার কাছেই অপেক্ষা করছে ইনফাডুস। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চলল সে। উপহার সামগ্রী বয়ে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল আমবোপা।

কয়েকশো গজ হেঁটে বিশাল এক আঙিনায় এসে ঢুকলাম আমরা। আঙিনার সীমান্ত ঘিরে বাঁশের বেড়া দেয়া। ভেতরের দিকে বেড়ার সমান্তরালে সারি সারি অগুনতি কুঁড়ে। এগুলো সব রানীদের বাড়িঘর। দু'দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় থেমেছে বেড়ার দুই প্রান্ত। ওখানেই প্রধান ফটক। ফটকের একটু দূরেই বিরাট এক কুঁড়ে, বাঁশ, বেত আর মাটির তৈরি। ওটা হল রাজপ্রাসাদ। টুয়ালা রাজার বাসস্থান।

রাজপ্রাসাদের সামনে, পেছনে, আশপাশে অনেকখানি খালি জায়গা। বিরাট এই চত্বরে রাজার দরবার বসেছে। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার যোদ্ধা। মাথায় পাখির পালক গোঁজা, হাতে আসেগাই আর ষাঁড়ের চামড়ায় তৈরি ঢাল। দেখার মত ব্যাপার।

টুয়ালার প্রাসাদের সামনে কয়েকটা টুল পাতা। আমাদেরকে বসতে ইশারা করল ইনফাডুস। তিনটা টুল দখল করলাম তিনজনে। পাশে দাঁড়িয়ে রইল আমবোপা। ইনফাডুস গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রাসাদের দরজার পাশে।

এতগুলো লোক জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়, কিন্তু টুঁ শব্দ নেই। স্তব্ধ নীরবতা বিশাল চত্বরে। অপেক্ষা করতে লাগলাম। আট হাজার চোখ দেখছে আমাদেরকে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।

এক মিনিট দু'মিনিট করে কেটে গেল পুরো দশ মিনিট। দরজা খুলল। বিরাট এক দানব এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। কাঁধ থেকে ঝুলছে চিতার চামড়ার আলখেল্লা, দু'পাশ চেরা।

দরজার বাইরে পা রাখল রাজা। তার সঙ্গে সঙ্গে বেরোল রাজকুমার ক্র্যাগা। তারপরেই বেরোল একটা বড় বানর। রোমশ চামড়ায় ঢাকা গা-মাথা।

এগিয়ে এসে একটা টুলে বসল রাজা। তার পাশে বডিগার্ডের মত দাঁড়াল ক্র্যাগা। রাজার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ল বানরটা।

একটু ও চিঁ ধরল না নীরবতায়, বরং আরও জমাট, আরও থমথমে হল।

হঠাৎই উঠে দাঁড়াল রাজা। কাঁধ থেকে খুলে ফেলে দিল আলখেল্লা। এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে, কালো পাহাড় যেন। সতর্ক হলাম। এত কুৎসিত মুখ জীবনে দেখিনি। মোটা মোটা ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক, একটা মাত্র চোখ টকটকে লাল। অন্য কোটরটা শূন্য, লালচে কালো একটা গর্ত, বীভৎস! এমনিতেই ভয়ঙ্কর চেহারা; তার ওপর ওই শূন্য কোটর কলজে কাঁপিয়ে দেয়। সাদা উটপাখির ধবধবে পালকের চমৎকার মুকুট পরেছে মাথায়। গায়ে লোহার শেকলের তৈরি একটা অদ্ভুত পোশাক। এ জিনিস কোথায় পেল ব্যাটা! কোমরে আর দু'হাঁটুতে জড়ানো সাদা গরুর লেজ, আভিজাত্য আর সেনাপতির চিহ্ন। ডান হাতে বিশাল এক বর্শা। গলায় সোনার মোটা

বিরাট বালা। কপালে চামড়ার বেল্ট, কায়দা করে তাতে বিশাল একটা আকাটা হীরে বসানো হয়েছে।

যোদ্ধাদের দিকে ফিরে হাতের আসেগাইটা তুলল টুয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে উঠে গেল আট হাজার আসেগাই। আট হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠলঃ 'কুম! কুম! কুম!' তিনবার উঠল টুয়ালার হাতের বর্শা, তিনবার উঠল আট হাজার বর্শা। তিন তিরিকে নয়বার উঠল 'কুম' ধ্বনি। রাজকীয় স্যালুট জানানো হল দানব রাজাকে। চিৎকারে কেঁপে উঠল ধরণী।

'লোকেরা, সব সময় রাজার অনুগত থাকবে,' চিঁ চিঁ করে উঠল একটা কণ্ঠস্বর। অবাক হয়ে দেখলাম, উঠে দাঁড়িয়েছে বানরটা। ওর গলা থেকেই ওই আজব স্বর বেরোচ্ছে। চড়া রোদ উঠেছে। গরম সইতে না পেরে কুঁড়ের ছায়ায় চলে গেল ওটা। 'লোকেরা, বলঃ রাজা, আমাদের মহান রাজা!'

আট হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'রাজা, আমাদের মহান রাজা!'

তারপর স্তব্ধ নীরবতা। কি জানি কেন আমাদের বাঁয়ের এক যোদ্ধার হাতের ঢাল মাটিতে পড়ে গেল হঠাৎ। তেমন একটা শব্দ হল না। কিন্তু অখণ্ড নীরবতায় ওই সামান্য শব্দই বেশি করে কানে বাজল। শান্তি নষ্ট হয়েছে। পাঁই করে ঘুরল টুয়ালা। বীভৎস একটা চোখ আগুন হানল।

'এই, এদিকে আয়!' গমগমে গলা টুয়ালার। কথা তো নয়, যেন বাজ পড়ল।

এগিয়ে গেল যোদ্ধা। কাচুমাচু হয়ে দাঁড়াল রাজার সামনে।

'হাতে জোর নেই, কুত্তা! ঢাল পড়ল কেন?' ভয়ঙ্কর গলায় ধমকে উঠল টুয়ালা। 'বিদেশীদের সামনে আমাকে খেলো করতে চাস? কি হল, কথা বলছিস না কেন?'

'ইচ্ছে করে ফেলিনি, মালিক,' বিড়বিড় করে বলল যোদ্ধা। 'হঠাৎ পড়ে গেছে।'

'তাহলে হঠাৎই শাস্তি ভোগ করতে হবে তোকে,' গর্জে উঠল টুয়ালা।

'আমি রাজার বলদ। মারুন কাটুন, যা খুশি করুন,' নিচু গলায় জবাব দিল যোদ্ধা, 'আপনার ইচ্ছে।'

'ক্র্যাগা!' আবার গর্জে উঠল টুয়ালা, 'দেখি তো, আসেগাই কেমন ছুঁড়তে পারিস? কুত্তাটার গায়ে মেরে দেখা।'

কয়েক কদম সামনে এগোল ক্র্যাগা। কুৎসিত হাসি ফুটেছে মুখে। বর্শা তুলল সে।

দু'হাতে চোখ ঢাকল হতভাগা যোদ্ধা। দাঁড়িয়ে আছে স্থির।

স্তব্ধ আতঙ্কে চেয়ে আছি আমরা।

একবার, দু'বার, বর্শাটাকে সামনে পেছনে করল ক্র্যাগা। হঠাৎ ছুঁড়ে মারল। নিখুঁত নিশানা। বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল যোদ্ধার। একটা আর্তনাদ বেরোল তার গলা চিরে। দু'হাত ঝটকা দিয়ে শূন্যে উঠে গেল। আছড়ে পড়ল মাটিতে। কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

অস্ফুট শব্দ উঠল আট হাজার গলায়। ঢেউয়ের মত দোল খেতে লাগল যেন শব্দ তরঙ্গ। কমতে কমতে থেমে এল এক সময়।

'গ-অ-ড!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি।

'বেশ ভাল হাত,' ছেলের প্রশংসা করল টুয়ালা। চারজন যোদ্ধাকে ডাকল। 'এই। এটাকে সরা।'

এগিয়ে এল চারজন লোক। তুলে নিয়ে গেল লাশটাকে।

'রক্ত ঢেকে দে, রক্ত ঢেকে দে,' চিঁ চিঁ করে উঠল বানরটা। 'দেরি করছিস কেন?'

কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। হাতে একটা মাটির পাত্র। তাতে চুনা পাথরের গুঁড়ো। মাটিতে পড়ে থাকা রক্তের ওপর ওই গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে লাগল সে।

রাগে থরথর করে কাঁপছেন স্যার হেনরি। দাঁতে দাঁত ঘষছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

'বসে পড়ুন, দোহাই আপনার!' তাঁর হাত ধরে টানলাম। 'আমাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়বে।'

দুপ করে আবার টুলে বসে পড়লেন স্যার হেনরি।

চুনাপাথরের গুঁড়ো ফেলে রক্তের চিহ্ন পুরোপুরি ঢেকে দিল মেয়েটা। আবার আমাদের দিকে ফিরল টুয়ালা। 'স্বাগতম, সাদা মানুষ।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। 'স্বাগতম, টুয়ালা, কুকুয়ানাদের রাজা।'

'কোথা থেকে আসা হয়েছে, সাদা মানুষদের? এখানে কি চাই?'

'তারার দেশ থেকে এসেছি আমরা। এই দেশ দেখব বলে।'

'অতি সামান্য একটা দেশ দেখার জন্যে অনেক দূর থেকে আসা হয়েছে। আর তোমার পাশের ওই লোকটা,' আমবোপাকে দেখিয়ে বলল টুয়ালা, 'ও-ও কি তারার দেশ থেকে?'

'অবশ্যই। তারার দেশেও তোমাদের মত কালো মানুষ আছে। তবে ওকে সাবধান করে দিয়েছি, তোমাদের মাথায় ঢুকবে না এমন কোন কথা যেন না বলে।'

সামান্য সামনে ঝুঁকল টুয়ালা। শাসাল, 'বড় বড় কথা বলছ, সাদা মানুষ। একটু আগে কুত্তাটার যে অবস্থা করলাম, তোমারও যদি একই দশা হয়? কিছু করতে পারবে?'

হা হা করে হেসে উঠলাম। কলজে কিন্তু কাঁপছে ভয়ে।

'সাবধান, রাজা!' ক্র্যাগা আর ইনফাডুসকে দেখিয়ে বললাম, 'আমাদের ক্ষমতার কথা কিছু বলেনি তোমাকে ওরা?'

'বলেছে। বজ্রের শব্দ তুলে কি করে খুন কর তোমরা, বলেছে,' ভোঁতা গলায় বলল টুয়ালা। ঠোঁট ওল্টাল। 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি।' হাত তুলে যোদ্ধাদের দিকে দেখাল। নির্লিপ্ত ভঙ্গি। 'ওদের যে কাউকে মেরে দেখাও, কেমন পার।'

'না,' দৃঢ় গলায় জবাব দিলাম। 'বিনা কারণে মানুষ খুন করি না আমরা। যদি আমাদের জাদু দেখতে চাও, কাউকে বল একটা ষাঁড় নিয়ে আসুক। গেটের দিকে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে বল। বিশ কদম পেরোনোর আগেই মেরে ফেলব আমি।'

দাঁত বের করে হাসল টুয়ালা। 'ষাঁড়? না হে, না। একজন মানুষ খুন করে দেখাও, বিশ্বাস করব।'

'বেশ। তোমার ছেলে ক্র্যাগাকে বল, গেটের দিকে হেঁটে যাক। ওকেই মেরে দেখাই,' বলে রাইফেল তুললাম।

অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোল ক্র্যাগার গলা থেকে। একছুটে কুঁড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল সে।

সেদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল টুয়ালা। তারপর দু'জন যোদ্ধাকে ডেকে বলল, 'মোটাতাজা দেখে একটা ষাঁড় নিয়ে আয়।'

ছুটতে ছুটতে চলে গেল লোক দুটো।

স্যার হেনরির দিকে ফিরে বললাম, 'ব্যাটারা ষাঁড় আনতে গেছে। আমি বলেছি, দূর থেকেই গুলি করে ষাঁড়টাকে মেরে ফেলতে পারব। কাজটা আপনি করুন। পিশাচগুলো জানুক, শুধু আমি আর গুডই না, আপনিও জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ।'

'এক্সপ্রেস রাইফেল নিয়ে তৈরি হলেন স্যার হেনরি।

'এক ব্যারেলের গুলি মিস হলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যারেল খালি করবেন,' বললাম। 'একশো পঞ্চাশ গজে নিশানা করুন। ষাঁড়টাকে দেখামাত্র গুলি করবেন।'

শোনা গেল চিৎকার, ষাঁড় তাড়ানোর শব্দ। ছুটে আসছে জানোয়ারটা। হৈ হৈ করে উঠল যোদ্ধারা। ঘাবড়ে গিয়ে গেটের দিকে ছুটল ষাঁড়টা।

গর্জে উঠল রাইফেল। মাত্র একবার। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ষাঁড়টা। হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পা নাচিয়ে স্থির হয়ে গেল।

বোবা হয়ে গেছে যেন আট হাজার লোক। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মরা ষাঁড়টার দিকে।

রাজার দিকে তাকালাম। শীতল গলায় বললাম, 'কি রাজা? মিথ্যে বলেছিলাম?'

'না, সাদা মানুষ, মিথ্যে বলনি,' রাজার গলায় ভয়।

'শোন, টুয়ালা,' বললাম, 'আমরা অশান্তি চাই না। এই যে দেখ,' ভেন্টভোগেলের উইনচেস্টারটা তুলে দেখালাম। 'এই জাদুলাঠিটা তোমাকে দিয়ে দেব। জন্তু-জানোয়ার মারতে পারবে। খবরদার! এটা দিয়ে কখনও মানুষ মারতে যেও না। তাহলে তোমাকেই খুন করে ফেলবে এই জাদুলাঠি।' রাইফেলটা বাড়িয়ে ধরলাম।

ভয়ে ভয়ে আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখলেন টুয়ালা।

চার হাত পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে এল বানরটা। রাজার পায়ের কাছে এসে থামল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হঠাৎই। মাথার ওপর থেকে খুলে ফেলে দিল রোমশ ঢাকনা।

আঁতকে উঠলাম। কি ভয়ানক চেহারা! বানর না, মানুষই! মেয়েমানুষ! অনেক, অনেক বয়েস। ঠিক কত, অনুমান করা কঠিন। চিড় চিড় হয়ে যাওয়া কাচের মত অসংখ্য ভাঁজ মুখের চামড়ায়। নাকের জায়গায় শুধু দুটো ফুটো। ফুটোর নিচে ভীষণ পুরু দুই ঠোঁট, মৌমাছির কামড়ে ফুলে আছে যেন। চোখা চিবুক, সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে। ধবধবে সাদা ভুরুর তলায় চঞ্চল একজোড়া বড় কালো চোখ, শয়তানীতে ভরা, জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। মাথায় চুল তো দূরের কথা, একটা রোমও নেই। টাকের চামড়া কুঁচকে গেছে। সাপের ফণার মত চৌকো খুলি।

ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে উঠে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

কথা বলে উঠল ডাইনীটা। চিঁ চিঁ গলার স্বর শুনে এর আগে হাস্যকর মনে হয়েছিল, চেহারাটা দেখার পর এখন ভয়ঙ্কর লাগছে। তীক্ষ্ণ কথাগুলো যেন বাতাস কেটে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, 'রাজা, শোন! যোদ্ধারা, শোন! মহাশক্তিশালী প্রেতাত্মা এসে ঢুকেছে আমার ভেতরে। ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি আমি। রক্ত! রক্ত! রক্তের নদী বইছে! সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে সবদিকে। শুধু রক্ত আর রক্ত! দেখতে পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি! রক্তের স্বাদ পাচ্ছি! মৃত্যুর পায়ের আওয়াজ শুনছি! আসছে! আসছে! আসছে ওরা। দূর থেকে এগিয়ে আসছে সাদা মানুষেরা!'

হঠাৎ ঘুরল ডাইনীটা। কঙ্কালসার একটা বিচ্ছিরি আঙুল তুলল আমাদের দিকে। 'তোমরা এদেশে কেন এসেছ, তারার মানুষেরা? হারানো একজনকে খুঁজতে এসেছ। কিন্তু লোকটা এখানে নেই। তোমরা উজ্জ্বল পাথরের জন্যে এসেছ। আমি জানি, আমি জানি!'

আমবোপার দিকে চাইল ডাইনী। আঙুল তুলে বলল, 'আর তুই! কালো চামড়া। উদ্ধত চেহারা। এদেশে তোর কি চাই? না, পাথর তো ঝলকাচ্ছে না! তুই পাথরের জন্যে আসিসনি। না, আসিসনি। তোকে চিনতে পারছি আমি। তোর শিরার রক্তের গন্ধ চেনা চেনা লাগছে। খোলস খোল, খুলে ফেল, ভাল করে দেখি...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল ডাইনীটা। টলে উঠল। দু'হাত চলে গেল গলার কাছে। ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল গলার ভেতর থেকে, টুঁটি টিপে ধরেছে যেন অদৃশ্য হাত। দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোতে লাগল।

কয়েকজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। তুলে কুঁড়ের ভেতর নিয়ে গেল ডাইনীটাকে।

উঠে দাঁড়াল রাজা। কাঁপছে। হাত নেড়ে ইশারা করল যোদ্ধাদেরকে। মার্চ করে বেরিয়ে যেতে লাগল যোদ্ধারা। আশ্চর্য শৃঙ্খলা! সঠিক পায়ের তাল।

মাত্র দশ মিনিট। চলে গেল আট হাজার যোদ্ধা। বিশাল চত্বরে আমরা চারজন, রাজা আর তার কয়েকজন অনুচর ছাড়া কেউ নেই। সব চলে গেছে।

'সাদা মানুষেরা,' গম্ভীর গলায় বলল টুয়ালা, 'তোমাদেরকে মেরে ফেলতে চাই। অদ্ভুত সব কথা বেরোল গাগুলের মুখ থেকে!'

www.boiRboi.blogspot.com

হেসে উঠলাম। 'সাবধান, রাজা! আমরা অত সহজ শিকার নই। দেখেছ তো জাদুলাঠির ক্ষমতা। এমন আরও অনেক ক্ষমতা আছে আমাদের।'

ভুরু কুঁচকাল টুয়ালা। 'রাজাকে ধমকাচ্ছ তোমরা!'

'ধমকাচ্ছি না, রাজা। যা সত্যি, তাই কেবল বলছি। আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা চালিয়ে দেখই না একবার। মজা টের পাবে।'

বিশাল থাবায় কপাল চেপে ধরল টুয়ালা। ভাবছে।

'ঠিক আছে, এখন আর কিছু বললাম না,' বলল রাজা। 'আজ রাতে ডাইনী শিকার হবে। কুমারীদের নাচ হবে। দেখতে এস। ভয় পেয়ো না, ফাঁদ পেতে রাখব না। তোমাদের নিয়ে কি করা যায়, আগামীকাল ভাবব।'

'তাই ভেব, রাজা,' তাচ্ছিল্য করে বললাম।

ঘুরল রাজা। গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল তার কুঁড়েয়।

আমাদের কাছে এল ইনফাডুস। ইশারায় অনুসরণ করতে বলে হাঁটতে শুরু করল।

গেটের কাছে এসে কি মনে হতে ঘুরে চাইলাম।

আরে! আমবোপা এখনও আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে রাজার কুঁড়ের দিকে। অবাক হয়ে দেখলাম, মুঠো তুলে নাড়ল আমবোপা। যেন ভয় দেখাল' কুঁড়েটাকে। তারপর ঘুরল। এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

রাজার আঙিনা থেকে বেরিয়ে নিজেদের কুঁড়ের দিকে চললাম আমরা।

নয়

কুঁড়েতে এসে পৌঁছুলাম। আমাদের সঙ্গে ভেতরে আসতে বললাম ইনফাডুসকে। এল সে।

'দেখেশুনে যা বুঝলাম,' বললাম আমি, 'সাংঘাতিক নিষ্ঠুর এই টুয়ালা!'

'ঠিকই বলেছেন, মালিক,' বলল ইনফাডুস। 'নিষ্ঠুরতার দেখেছেন কি? দেখবেন আজ রাতে। ডাইনী শিকারের নামে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ খুন করা হবে। টুয়ালার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এদেশ।'

'তাহলে ধরে ব্যাটাকে গদি থেকে নামিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'দিলে কি হবে? টুয়ালা গেলে গদিতে বসবে তার ছেলে স্ক্যাগা। ওটা আরও হারামি। বাপের চেয়েও অন্তর আরও বেশি কালো তার। হ্যাঁ, ইমোটু কিংবা তার ছেলে ইগনোসি বেঁচে থাকলে এক কথা ছিল। কিন্তু ওরা তো আর বেঁচে নেই।'

'কি করে জানলে ইগনোসি মারা গেছে?' হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল আমবোপার কণ্ঠ।

'কি বলতে চাও?' কড়া গলায় বলল ইনফাডুস। 'তোমাকে কথা বলতেই বা বলেছে কে?'

'শোন, ইনফাডুস,' শান্ত গলায় বলল আমবোপা। 'একটা গল্প শোনাচ্ছি তোমাকে। ইমোটুর স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিল এদেশ থেকে। সঙ্গে ছিল তার শিশুপুত্র ইগনোসি। ওরা আসলে মরেনি। মরুভূমির একদল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের। দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছিল ওই মানুষেরা। সঙ্গে নিয়ে পর্বত পার করেছিল, পার করে দিয়েছিল মরুভূমি।'

'তুমি কি করে জানলে?' প্রশ্ন করল ইনফাডুস।

'বলছি। চুপচাপ শুনে যাও। মরুভূমি পেরিয়েও থামল না মা-ছেলে। চলতেই থাকল। শেষে একদিন এক দেশে গিয়ে পৌঁছুল ওরা। ওখানে এক দয়ালু লোক দয়া

করে আশ্রয় দিলেন ওদের। তাঁর কাছেই বহু বছর রয়ে গেল দু'জনে। একদিন মারা গেল মা। পথে বেরিয়ে পড়ল ছেলে। বুকে করে নিয়ে গেল মায়ের শেষ কথাগুলো। ছেলে তখন জানে, কে তার বাপকে খুন করেছে, কে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। অনেকদিন এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে কাটাল ছেলে। এক মহান যোদ্ধার কাছে শিখল যুদ্ধবিদ্যা। যুদ্ধ করল তাঁর শত্রুর সঙ্গে। একদিন বেরিয়ে পড়ল ওখান থেকেও। এক জায়গায় এসে শুনল, ভয়াল মরু পেরোতে যাচ্ছে কয়েকজন সাদা মানুষ। বরফে ঢাকা সুলিমান বার্গ পেরিয়ে ওপারে যাবে ওরা। ভিড়ে গেল সে ওদের দলে। শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে এল মরুভূমি, পর্বত। পৌঁছুল এসে কুকুয়ানাদের দেশে। ওই ছেলের দেখা হল তোমার সঙ্গে।'

'পাগল! তুমি পাগল!' আপনমনেই বিড়বিড় করল বুড়ো চীফ।

'না, চাচা, আমি পাগল না, সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বাস না হলে এই দেখ,' এক টানে গায়ের চাদর খুলে ফেলে দিল আমবোপা। খুলে ফেলল কোমরে জড়ানো কাপড়। 'এই দেখ, আমি ইগনোসি। এই যে দেখ চিহ্ন,' নাভির নিচে আঁকা সাপের ছবি দেখাল সে। নীল উল্কিতে আঁকা সাপের মুখ চলে গেছে নিচের দিকে, উরুসন্ধির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সাপের ছবির দিকে চেয়ে রইল ইনফাডুস। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। 'কুম! কুম!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমার ভাইয়ের ছেলে। আসল রাজা!'

আমবোপা ওরফে ইগনোসি একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ডাকল, 'ওঠ, চাচা, ওঠ। এখনও রাজা হতে পারিনি আমি। তবে তুমি সাহায্য করলে পারব। ভেবে দেখ কাকে চাও। আমাকে, না টুয়ালাকে?'

উঠে দাঁড়াল ইনফাডুস। একটা হাত রাখল ইগনোসির কাঁধে। 'রীতি অনুসারে তুমিই আসল রাজা। তোমার জন্যে টুয়ালার বিরুদ্ধে লড়ব আমি।'

'যদি আমি জিততে পারি, আমার রাজ্যের সেরা মানুষ হিসেবে গণ্য হবে তুমি,' বলে আমাদের দিকে ফিরল ইগনোসি। 'সাদা মানুষেরা, আমাকে সাহায্য করবেন?'

কি হচ্ছে, কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারেননি ক্যাপ্টেন গুড আর স্যার হেনরি। দ্রুত ওদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত, আলোচনা সেরে নিলাম। ইগনোসির দিকে ফিরে বললাম, 'ইগনোসি, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তোমাদের সমাজের নিয়মে আসল রাজা হবার কথা তোমারই। কিন্তু গদিতে বসে আছে খুনেটা। ওকে হটাবে কি করে, ভেবেছ?'

'জানি না,' ইনফাডুসের দিকে তাকাল ইগনোসি। 'চাচা, তুমি কিছু বলতে পার?'

'আজ রাতে,' বলল ইনফাডুস, 'মহান নাচের উৎসব হবে। চলবে ডাইনী শিকার। খুন করা হবে অনেক লোককে। টুয়ালার ওপর ভীষণ খেপা লোকে। এইই সুযোগ। তিনজন সেনা প্রধানকে ডেকে আনব তোমার কাছে। ওদেরকে বোঝাতে পারলে, বিশ হাজার যোদ্ধা দলে পেয়ে যাবে। কিন্তু রাজা, কিছু একটা চিহ্ন তো দেখাতে হবে ওদেরকে। বোঝাতে হবে, আসলেই তুমি ওদের রাজা।'

'সাপের ছবি তো আছেই আমার গায়ে। দেখাব,' বলল ইগনোসি।

'ওতে হবে না, রাজা। ওটা জালিয়াতিও হতে পারে। যে কেউ উল্কি দিয়ে ওরকম সাপ এঁকে নিতে পারে গায়ে। আমি বিশ্বাস করছি, কিন্তু ওরা করবে না। ওরা জানে, রাজার অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। সেরকম কিছু একটা দেখাতে হবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল ইগনোসি। অলৌকিক কি ক্ষমতা দেখাবে সে?'

'ইনফাডুস,' বললাম, 'দেবতা তো আসল রাজার পক্ষেই থাকেন। রাজার হয়ে অন্য কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলেও তিনি দেবেন। নাকি?'

'হ্যাঁ, দেবেন,' মাথা দুলিয়ে বলল ইনফাডুস।

www.boiRboi.blogspot.com

'ঠিক আছে,' বললাম। 'দেবতার কাছে আমরাই সাহায্য চাইব। ইনফাডুসের হয়ে চিহ্ন দেখাব আমরা। যাও, গিয়ে বল সেনা প্রধানদের। বল, তাদের রাজা ইগনোসি ফিরে এসেছে।'

'যাচ্ছি, মালিক,' বলে বেরিয়ে গেল ইনফাডুস।

বলে তো দিলাম ইনফাডুসকে, কিন্তু অলৌকিক কি দেখাব? কথা রাখতে না পারলে, ইগনোসির সর্বনাশ তো হবেই, আমরাও বিপদে পড়ব। আমাদের ওপরও আর আস্থা রাখতে পারবে না ইনফাডুস।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসলাম গুড আর স্যার হেনরির সঙ্গে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন স্যার হেনরি। কিন্তু মাথা ঝাঁকাল গুড। 'আমার মনে হয় পারব আমরা।'

উঠে গিয়ে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এল গুড। তালা খুলে ছোট একটা পঞ্জিকা বের করল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থামল। 'এই যে, দেখ, আজ জুনের চার তারিখ।'

'তাতে কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন স্যার হেনরি।

'তাতেই তো হয়েছে,' বলল গুড। ধীরে ধীরে পড়ল, 'চৌঠা জুন। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। গ্রীনউইচ সময় আটটা পনেরো মিনিটে শুরু হবে। দেখা যাবে, টেনেরিফ, দক্ষিণ আফ্রিকা...ইত্যাদি ইত্যাদি।' মুখ তুলে বলল, 'তার মানে, পাওয়া গেল অলৌকিক ব্যাপার।'

'ও ঠিকই বলেছে, ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরি। 'দারুণ আইডিয়া!' গুডের বুকে চাপড় মারলেন। 'গুড, তুমি একটা জিনিয়াস!'

'ধন্যবাদ, খোকা,' হেসে বলল গুড। 'গুরুকে চিনতে পেরেছ তাহলে এতদিনে।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'কোয়াটারমেইন, ব্যাটারা এলে বলে দিও, আজ রাতে চাঁদকে কালো করে দেব আমরা।'

'বলব। কিন্তু পঞ্জিকায় ভুল লেখা হয়ে থাকলে ঈশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না আমাদেরকে।'

'ভুল সাধারণত হয় না এসব পঞ্জিকায়। গ্রীনউইচ সময় আটটা পনেরো, তারমানে এখানে গ্রহণ শুরু হবে রাত দশটার পর। সাড়ে বারোটার আগে ছাড়বে না।'

'ফেঁসে তো গেছিই,' বললেন স্যার হেনরি। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। যাই বলুন, কোয়াটারমেইন, গুডের আইডিয়াটা ভাল।'

আমিও স্বীকার করলাম। ইগনোসিকে বললাম, 'ইগনোসি, আজ রাতে চাঁদ কালো করে দেব আমরা। আঁধারে ঢেকে যাবে তোমাদের দেশ। কেমন হবে?'

'অবাক হয়ে গেল ইগনোসি। চন্দ্রগ্রহণ কাকে বলে জানে না সে। বলল, 'সত্যি, সত্যিই পারবেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, পারব।'

'বিশ্বাস করা কঠিন! কিন্তু জানি, আপনারা ফালতু কথা বলেন না। ঠিক আছে, করুন যা ভাল বোঝেন।'

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। ভেতরে আসতে বললাম। তিনজন লোক ঢুকল কুঁড়েতে। রাজার কাছ থেকে এসেছে। আমাদের জন্যে উপহার পাঠিয়েছে টুয়ালা। তিনটা শেকলের শার্ট, আর সুন্দর তিনটা কুঠার।

'এগুলো পাঠিয়েছেন আমাদের রাজা। তারার সাদা মানুষদের জন্যে উপহার,' বলল একজন লোক।

'রাজাকে বল গিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়েছি আমরা,' বললাম।

বেরিয়ে গেল তিনজনে।

একটা শার্ট তুলে নিলাম। চমৎকার জিনিস। লোহার সরু শক্ত শেকলকে গায়ে

গায়ে আটকে আশ্চর্য কৌশলে চাদর বানানো হয়েছে। সেই চাদরকে আবার সাইজ করে নিয়ে বানানো হয়েছে শার্ট। কি করে এই অদ্ভুত কারিগরিটা করা হল, কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না।

কুঁড়ের বাইরে থেকে আবার ডাক শোনা গেল। ইনফাডুস এসেছে। আসতে বললাম ওকে। সঙ্গে আধডজন যোদ্ধা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। যোদ্ধাদের বেশভূষা দেখেই বুঝলাম, উঁচু পদের লোক।

ইনফাডুস বলতেই আবার কাপড় খুলে ফেলল ইগনোসি। পেটে আঁকা সাপের ছবি দেখাল সেনা-প্রধানদের। শোনাল সেই কাহিনী, কি করে সে আর তার মা পর্বত পেরিয়েছিল। কি করে বেঁচে ফিরে এসেছে আবার।

'সব তো শুনলে। সাপও দেখলে,' ইগনোসির কথা শেষ হলে বলল ইনফাডুস। 'বল, এখন কি করতে চাও। ওর পক্ষে দাঁড়াবে? ওকে বাপের গদি ফিরে পেতে সাহায্য করবে?'

ছ'জনের মাঝে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটি এক কদম এগিয়ে এল। মাথার চুল ধবধবে সাদা, কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও অটুট। বলল, 'টুয়ালার অত্যাচারে এদেশের লোক জর্জরিত। ওকে সরাতে পারলে খুশিই হব। কিন্তু ওকে সরিয়ে কাকে গদিতে বসাচ্ছি ভালমত জানতে হবে আগে। কে জানে, ওই লোকটা মিথ্যেবাদী জালিয়াত কিনা! সত্যিই যদি আসল রাজা হয়ে থাকে, দেবতার চিহ্ন দেখাতে হবে আমাদেরকে। নইলে কিছু করব না আমরা।'

অন্যেরাও সায় দিল বুড়ো চীফের কথায়।

'চীফ,' বুড়োর দিকে চেয়ে বললাম, 'ইগনোসির হয়ে আমি যদি কেরামতি দেখাই? চলবে?'

'নিশ্চয় চলবে,' বলল বুড়ো।

'বেশ,' বললাম। 'তোমরা কেউ চাঁদকে কালো করে ফেলতে পারবে? সারা দেশ অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারবে?'

'না, মালিক,' হাসল বুড়ো। 'কোন মানুষই পারবে না।'

'আমরা পারব। আজ রাতে চাঁদকে কালো করে দেব আমরা। সারা পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যাবে। ইগনোসির প্রতি সমর্থন দেখাতে এই কাজটা করবেন দেবতা। আমরা অনুরোধ করেছি তাঁকে। এরপর ইগনোসিকে রাজা বলে মেনে নিতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়, মালিক,' একসঙ্গে বলে উঠল সেনাপ্রধানরা।

'লুয়ের মাইল দুয়েক দূরে,' কথা বলল এবার ইনফাডুস, 'নতুন চাঁদের মত বাঁকা একটা পাহাড় আছে। মালিকেরা চাঁদকে কালো করে ফেললে, যোদ্ধাদের নিয়ে ওখানে চলে যাব আমরা। ওখান থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা করব টুয়ালার বিরুদ্ধে।'

'বেশ,' বললাম। 'এখন যাও তোমরা। অনেক তুকতাক বাকি আছে আমাদের। শেষ করতে হবে। চাঁদকে কালো করে দেব, সোজা কথা তো না।'

কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল ছয় সেনাপ্রধান। ইনফাডুস রয়ে গেল। পড়ে থাকা তিনটে শেকলের শার্ট দেখিয়ে বলল, 'ওগুলো কারা বানিয়েছে, জানি না আমরা। বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছি, আগে অনেক ছিল, এখন অল্প কয়েকটা অবশিষ্ট আছে। যুদ্ধের সময় খুব কাজে লাগে। ওই শার্ট যার গায়ে থাকে, সহজে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না কেউ। টুয়ালা নিশ্চয় আপনাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছে, কিংবা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে, নইলে ওই জিনিস হাতছাড়া করত না সে। আজ রাতে নাচের আসরে যাবার আগে ওই শার্ট পরে নেবেন, মালিক।'

বেরিয়ে গেল ইনফাডুস।

বুড়ো সেনাপ্রধানের কথা জানালাম স্যার হেনরি আর গুডকে। ইনফাডুসের পরামর্শ

www.boiRboi.blogspot.com

আমাদের তিনজনেরই পছন্দ হল।

দশ

মনে উত্তেজনা। সারাটা দিন শুয়ে বসে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলাম আমরা।

বিকেল গড়াল। সূর্য ডুবল। রাতের আঁধার নামতেই জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন কুকুয়ানা দেশ। বহু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আলোয় আলোকিত চারদিক। সবাই এগিয়ে চলেছে রাজার আঙিনার দিকে। মার্চ করে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার যোদ্ধা।

তৈরি হতে লাগলাম আমরা। তিনজনে তিনটা লোহার শার্ট পরে নিয়ে তার ওপরে নিজের জামাকাপড় চাপালাম। ভেবেছিলাম, লোহার জিনিস গায়ে চাপালে কেমন জানি লাগবে! না, তেমন অস্বস্তি লাগল না। সহজেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কোমরের বেল্টের খাপে ভরে নিলাম গুলি ভরা রিভলভার।

রাত আটটায় চাঁদ উঠল। এল ইনফাডুস। সঙ্গে বিশজন যোদ্ধা। আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে টুয়ালা।

তিনজনে তিনটা কুঠার তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম কুঁড়ে থেকে। চললাম ইনফাডুসের পিছু পিছু।

লোকে লোকারণ্য টুয়ালার আঙিনা। শৃঙ্খলার সঙ্গে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে যোদ্ধারা, ভাগ ভাগ হয়ে। লোক চলাচলের জন্যে সরু পথ রাখা হয়েছে প্রতি দুটো দলের মাঝে। ওই পথে এগিয়ে যাবে ডাইনী শিকারিরা। খুঁজে বার করবে কার ভেতরে ডাইনী এসে ঠাঁই নিয়েছে।

এতগুলো লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, কিন্তু কোনরকম হট্টগোল নেই।

পুবের আকাশে আরও উঠে এসেছে চাঁদ। হলদে আলোয় চকচক করছে বিশ হাজার বর্শার ধারালো ফলা।

'খুব বেশি নীরব হয়ে আছে ওরা,' মন্তব্য করলাম।

'কি করবে? কে মরবে কে বাঁচবে জানে না তো,' গম্ভীর গলায় বলল ইনফাডুস। 'ওদের অনেকেই সকাল দেখবে না আর।'

'অনেক লোক মারা যাবে?'

'অনেক।'

'আমাদের বিপদ কতখানি?'

'বলতে পারব না, মালিক। তবে ভয় পেলেও প্রকাশ করবেন না কিছুতেই। আজ রাতটা যদি ভালয় ভালয় কাটিয়ে দিতে পারেন, আর চিন্তা নেই।'

হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছি। খোলা জায়গা পেরিয়ে রাজার কুঁড়ের কাছে এসে পড়লাম। সামনেই বিছানো রয়েছে টুলগুলো, সকালের মতই। দেখলাম, কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আসছে রাজকীয় দল।

টুয়ালা বেরোল, সঙ্গে ক্ল্যাগা আর গাগুল। টুয়ালার পেছন পেছন আসা এক ডজন বিশালদেহী লোককে দেখাল ইনফাডুস। বলল, 'ওরা জল্লাদ।'

কাছে এসে গেল দলটা। ভয়ানক চেহারার বারোজন মানুষ। এক হাতে চোখা বর্শা, আরেক হাতে কাঠের ভারি মুগুড়। ডাইনীহত্যার অস্ত্র।

মাঝখানের একটা বড় টুলে বসে পড়ল টুয়ালা। ওর পায়ের কাছে বসল গাগুল। অন্যেরা দাঁড়িয়ে রইল পেছনে।

'এস, সাদা মানুষেরা,' আমাদের অভ্যর্থনা জানাল টুয়ালা। 'বস। সময় নষ্ট করা যাবে না। চাঁদ অনেক ওপরে উঠে গেছে। সামনে অনেক কাজ, অথচ রাতটা খুবই

ছোট। গাগুল, তোমার কাজ শুরু করে দাও। খুঁজে বের কর ডাইনীদের।'

'শুরু কর! শুরু কর!' চিঁ চিঁ করে চেঁচিয়ে উঠল গাগুল। 'খাবারের জন্যে ডাকাডাকি করছে হায়েনারা। শুরু কর!'

সকালের মতই বর্শা তুলল টুয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে বর্শা তুলে রাজাকে তিনবার স্যালুট করল বিশ হাজার যোদ্ধা। তাদের সম্মিলিত চিৎকারে ভেঙে খানখান হয়ে গেল রাতের নীরবতা, পায়ের আঘাতে কেঁপে উঠল মাটি।

শেষ হল রাজকীয় স্যালুট। আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ দূর প্রান্ত থেকে শোনা গেল একটা সুরেলা চিৎকার। 'মেয়েমানুষের পেটে জন্মানো সব মানুষের ভাগ্যে কি আছে?'

একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সবক'টা যোদ্ধাকণ্ঠ, 'মৃত্যু!'

বার বার চলল একই প্রশ্ন, একই উত্তর। তারপর থামল এক সময়। দূর পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত হয়ে ফিরে এল সুরের রেশ। মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

আবার সব নীরব স্তব্ধ, থমথমে নিঃশব্দতা চারদিকে। হঠাৎই বেরিয়ে এল দলটা। যোদ্ধাদের মাঝে কোথায় জানি লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এক সারিতে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল ওরা। একদল মেয়েমানুষ। বুড়ো হয়ে গেছে। মোট দশজন। দশজনেরই মাথার চুল সাদা, বাবরি হয়ে নেমে গেছে কাঁধের ওপর। সাদা আর হলুদ রঙের ডোরাকাটা সারামুখে। পিঠে লম্বা হয়ে ঝুলছে সাপের চামড়া। কোমরে মানুষের খুলির মেখলা। হাতে মানুষের পায়ের একটা করে লম্বা হাড়, ওগুলো জাদুলাঠি।

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল ডাইনীর দল। হাতের হাড় গাগুলের দিকে তুলে ধরল এক ডাইনী। চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা এসেছি, মা।'

'ভাল! ভাল! ভাল!' চিঁ চিঁ করে উঠল গাগুল। 'এস মেয়েরা। তোমাদের চোখের দৃষ্টিতে শাণ দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, মা!' জবাব দিল দশ ডাইনী।

'তোমাদের কান খুলেছ? রক্তের গন্ধ পাচ্ছে নাক? রাজার বিরুদ্ধে যারা যেতে চায়, সেই শয়তানদের খুঁজে বের করতে তৈরি সবাই?'

'হ্যাঁ, মা!' আবার সম্মিলিত জবাব।

'তাহলে যাও, মেয়েরা। তারা থেকে আসা সাদা মানুষেরা দেখার জন্যে ব্যাকুল। যাও, মেয়েরা, যাও। শয়তানদের খুঁজে বের কর।

কলজে কাঁপানো তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ডাইনীরা। ছুটে গেল স্থির দাঁড়িয়ে থাকা যোদ্ধাদের দিকে।

দুরু দুরু বুকে চেয়ে আছি। আমাদের সামনে রয়েছে যোদ্ধারেদ একটা দল। সামনে গিয়ে দাঁড়াল এক ডাইনী। নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল বাতাসে। তারপর নাচতে শুরু করল উন্মাদের মত। চেঁচিয়ে বলল, 'গন্ধ পাচ্ছি! গন্ধ পাচ্ছি! শয়তানটা এখানেই কোথাও আছে। রাজার বিরুদ্ধে চিন্তা চলছে তার মনে! শয়তানি ফন্দি আঁটছে!'

হঠাৎ থেমে গেল ডাইনী-বুড়িটা। শিকারের পাখি দেখতে পেয়েছে যেন শিকারি কুকুর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে তার সামনের যোদ্ধাটার দিকে। থমকে দাঁড়াল। তারপর সরে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। যার সামনেই গিয়ে দাঁড়ায় বুড়ি, লোকটা সরে যায় একপাশে, আতঙ্কে।

বেশি খোঁজাখুঁজি করল না বুড়ি। হঠাৎ একজন লম্বা যোদ্ধার গায়ে জাদুলাঠি ছুঁইয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

লোকটা এক কদম সরতে পারল না, তার আগেই দু'পাশ থেকে ওকে চেপে ধরল কয়েকজন যোদ্ধা। হতভাগা লোকটার হাত থেকে খসে পড়ে গেল বর্শা। টেনেহিঁচড়ে তাকে টুয়ালার সামনে নিয়ে আসা হল।

লাফিয়ে লোকটার কাছে চলে এল দু'জন জল্লাদ। রাজার দিকে ফিরে অনুমতির অপেক্ষা করতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

'মার!' আদেশ দিল রাজা।

'মার!' চিঁ চিঁ করে উঠল গাগুল।

'মার!' আনন্দ ধ্বনি করল জ্যাগার।

রাজার মুখ থেকে আদেশ খসতে না খসতেই কাজ সমাধা হয়ে গেল। হতভাগা লোকটার হৃৎপিণ্ডে বর্শা ঢুকিয়ে দিল একজন। অন্যজন এক বাড়িতে খুলি গুড়িয়ে দিল। ছিটকে পড়ল রক্তমাখা তাজা মগজ।

'এক,' গুনল টুয়ালা।

লাশটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল একপাশে। ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলা হয়েছে আরেকজনকে।

'দুই,' গুনল টুয়ালা।

চলল ওই পৈশাচিক খেলা। দেখতে দেখতে আমাদের সামনে লাশের পাহাড় জমে উঠল। খুন হয়ে গেল শ'য়ে শ'য়ে মানুষ।

আর সইতে পারলাম না এই নিষ্ঠুরতা। প্রতিবাদ করার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

আমাকে বসে পড়তে বলল টুয়ালা। বলল, 'ওই কুত্তাগুলোর মনে শয়তান ঢুকেছিল। ওদের মরাই ভাল। আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও, সাদা মানুষ।'

কি করব? চুপচাপ বসে পড়লাম আবার টুলে। রাত সাড়ে দশটা বাজল। ডাইনী হত্যা চলেছে সমানে। এই সময়ই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল গাগুল। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

'সেরেছে!' কানের কাছে ফিসফিস করল গুড। 'ডাইনীটা আমাদের দিকে নজর দিয়েছে!'

'ঠিক!' রিভলভারে হাত রাখলাম। 'আমাদের রক্ত চায়!'

বুকের ভেতর দুপদাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। চিকন ঘাম বেরিয়ে এল। সামনে পড়ে থাকা লাশের পাহাড়ের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল শরীর।

এগিয়ে আসছে ডাইনীটা। সাপের চোখের মত ঠাণ্ডা চোখজোড়ায় চাঁদের আলো পড়ে জ্বলছে। আমাদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

'পয়লা কার পালা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন স্যার হেনরি।

মুহূর্ত পরেই জানলাম কার পালা। হেঁটে আসতেই যেন কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আশ্চর্য গতিতে ছুটে গেল ডাইনীটা। ইগনোসির গা ছুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি! এর ভেতরে শয়তান! শয়তান! রক্তের নদী বইয়ে ছাড়বে! রাজা, ও রাজা, জলদি মারার আদেশ দাও! জলদি!'

এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। লাথি মেরে পেছনে সরিয়ে দিলাম টুলটা। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কখনও না! একে মারার আদেশ দিও না, রাজা! ও আমাদের গাইড!'

'গাগুল ওর ভেতরে শয়তানের গন্ধ পেয়েছে,' ভোঁতা গলায় জবাব এল টুয়ালার কাছ থেকে। 'ওকে মারতেই হবে, সাদা মানুষ।'

এক টানে রিভলভার বের করে আনলাম। 'ওর গায়ে হাত তুলতে এলেই মরবে। যে-ই আস।'

'ধর ওকে!' ইগনোসির দিকে আঙুল তুলে হুঙ্কার ছাড়ল টুয়ালা।

ছুটে এল দু'জন জল্লাদ।

উঠে পড়লেন স্যার হেনরি। গুডও উঠে পড়েছে। সামনের দিকে রিভলভার তাক করলেন স্যার হেনরি। গুড তাক করল গাগুলের দিকে। আমি রিভলভার ফেরালাম টুয়ালার দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই জল্লাদ।

'রাজা,' ডেকে বললাম, 'এখন কি করতে চাও?'

'জাদুলাঠি সরিয়ে রাখ, সাদা মানুষ,' গলার স্বর খাদে নেমে গেছে টুয়ালার। 'ঠিক আছে। বাঁচবে কালোটা! তোমরা ঠেকালে, নইলে ও এতক্ষণে মরে যেত।'

'আমাকে মারার আগেই তোমাকে খুন করে ফেলব আমি, রাজা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ইগনোসি।

কালো লোকটার দুঃসাহস দেখে চমকে গেল টুয়ালা। বলে কি? 'বড় বেশি বাড় তোর, সাদা মানুষের কুত্তা!' গর্জে উঠল রাজা।

'যে সত্যের পথে থাকে, বাড় তার একটু বেশিই থাকে,' পাল্টা জবাব দিল ইগনোসি।

ধক ধক করে জ্বলছে টুয়ালার ভয়াবহ চোখটা। রাগে কথা বন্ধ হয়ে গেছে তার।

'এসব খুনোখুনি আমাদের অপছন্দ, রাজা,' বললাম আমি। 'এর চেয়ে ভাল কিছু যদি থাকে, দেখাও। কুমারীদের নাচ দেখতে আগ্রহী আমরা।'

হাত ওল্টাল টুয়ালা। 'বেশ...এই, নাচ শুরু কর তোমরা। পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই কুত্তাগুলোকে ফেলে দিয়ে আয়, ভাগাড়ে।'

দ্রুত সরিয়ে ফেলা হল লাশগুলোকে।

অপেক্ষা করছি আমরা। বেজে উঠল ঢাক। ঢাক দুটো কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না। ধীর লয়ে বাজছে।

কুঁড়ের আড়াল থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল একদল মেয়ে। মাথা গলা বাহুতে ফুলের মালা জড়ানো। বিচিত্র ভঙ্গিতে শরীর বাঁকিয়ে নাচছে। এগিয়ে এল খোলা জায়গায়। মেয়েগুলো সুন্দরী। চাঁদের আলোয় অপূর্ব লাগছে ফুলজড়ানো কালো দেহগুলো।

দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে ঢাকের বাজনা, আওয়াজ চড়ছে। শেষ পর্যায়ে উঠে থেমে গেল আচমকা। স্তব্ধ নীরব হয়ে গেল আশপাশটা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে নর্তকীরা। কোনরকম জানান না দিয়েই দল থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে, খুবই সুন্দরী। আবার বেজে উঠল ঢাক। বাজনার তালে তালে ঘুরে ঘুরে একাই নেচে চলল সে।

প্রথম মেয়েটার খানিক পরই দল থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা মেয়ে। তারপর আরেকটা। আরও একটা।

ঢাকের তালে তালে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে নাচল মেয়েগুলো। একসময় হাত তুলল টুয়ালা, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঢাক। থেমে গেল নাচ।

'কোন্ মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী, সাদা মানুষ?' আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করল টুয়ালা।

'পয়লাটা,' বললাম। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম মেয়েটাকে।

মাথা ঝাঁকাল টুয়ালা। 'ঠিক। কিন্তু ওকে মরতে হবে।'

'হ্যাঁ, মরতে হবে!' চিঁ চিঁ করে উঠল গাগুল।

'কেন, রাজা?' কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম। 'মেয়েটা সুন্দরী, বয়েস কম। নেচেছেও ভাল। ওর তো পুরস্কার পাবার কথা। মরতে হবে কেন?'

হেসে উঠল টুয়ালা। জবাব দিল, 'এদেশে একটা রীতি আছেঃ কুমারী নাচের রাতে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। নইলে রাজা আর তার বাড়িঘর সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

জল্লাদদের দিকে চেয়ে আদেশ দিল টুয়ালা, 'মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এস।' ক্র্যাগকে বলল, 'আসেগাই নিয়ে তৈরি হ।'

দু'জন জল্লাদ এগিয়ে গেল। চিৎকার করে পালাতে গেল মেয়েটা। পারল না। ধরে ফেলল ওকে কঠিন চারটে হাত। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে বেচারি। জল্লাদদের হাত থেকে ছাড়া পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। টেনেহিঁচড়ে ওকে আমাদের সামনে নিয়ে এল জল্লাদেরা।

'তোমার নাম কি, মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল গাগুল। 'কি হল, কথা বলছ না কেন? ও,

www.boiRboi.blogspot.com

দেমাক! এই ক্র্যাগা, আয়তো এদিকে।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেছে ক্র্যাগার। এক লাফে এগিয়ে এল সে। বর্শা তুলল।

'খবরদার!' পাশে থেকে গুডের হুঙ্কার শুনলাম। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। উদ্যত রিভলভারের নল ক্র্যাগার দিকে। খপ করে গুডের হাত চেপে ধরলাম। 'রাখ, রাখ, কি করছ!'

'এবার চট করে নামটা বলে ফেলতো, ছুঁড়ি,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল গাগুল।

'আমার নাম ফুলাটা,' কাঁপছে মেয়েটার গলা। 'আমাকে মরতে হবে কেন? আমি...আমি কি করছি?'

'বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল,' বিড়বিড় করল ডাইনীটা। 'আর রাজার ছেলের হাতে মরা তো রীতিমত সৌভাগ্য।'

'না, মা, না-আ!' কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে লাফ দিল গুড। চেঁচিয়ে বলল, 'কালো ইবলিসের দল! মেয়েটার গায়ে হাত দিবি তো ভাল হবে না!'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেছে গুডের দিকে। একটু ঢিল পড়ল, এই সুযোগে এক ঝটকায় জল্লাদদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। আছড়ে পড়ল গুডের পায়ের কাছে। ককিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও, তারার সন্তান!'

'ভয় নেই, খুকি,' ফুলাটার কথা না বুঝেই বলল গুড। 'আমি তো আছি।'

ঘুরে ছেলের দিকে চাইল টুয়ালা। ইশারা করল। নির্দেশ পেয়ে বর্শা তুলে এগিয়ে আসতে লাগল ক্র্যাগা।

'কি হল?' আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন স্যার হেনরি। 'চুপ করে আছেন কেন এখনও?'

চাঁদের দিকে চেয়ে বললাম, 'কোন লক্ষণ দেখছি না। গ্রহণ হবে কখন।'

'জানি না। কিছু একটা করুন। নইলে বাঁচানো যাবে না মেয়েটাকে।'

উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম ক্র্যাগা আর ফুলাটার মাঝামাঝি। 'টুয়ালা, ওকে ছেড়ে দাও।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টুয়ালা। গর্জে উঠল, 'ছেড়ে দেবে! সিংহকে হুমকি দিচ্ছে সাদা কুত্তার দল! এই ক্র্যাগা, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? খতম করে দে ছুঁড়িটাকে!' জল্লাদদেরকে আদেশ দিল, 'এই ব্যাটারা! চুপ করে আছিস কেন? ধর, কুত্তাগুলোকে!'

এগিয়ে এল জল্লাদরা। কুঁড়ের দিক থেকে ছুটে এল একদল সশস্ত্র যোদ্ধা।

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন স্যার হেনরি, গুড আর ইগনোসি। রিভলভার আবার কোমরে চলে গেছে। তিনজনের হাতেই এখন উদ্যত রাইফেল।

'খবরদার!' গর্জে উঠলাম। কলজে শুকিয়ে গেছে ভয়ে, কিন্তু জোর করে সংযত রাখলাম নিজেকে। 'আর এক পা এগোলেই চাঁদের আলো নিভিয়ে দেব! ভুলে যেও না, স্বর্গ থেকে এসেছি আমরা। অবাধ্যতা করার চেষ্টা করে দেখ, মজা টের পাবে!'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লোকগুলো। দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। ক্র্যাগা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে।

'শুনেছ কথা!' চিঁ চিঁ করে উঠল গাগুল। 'মিথ্যুকটার কথা শুনেছ? চাঁদকে নাকি নিভিয়ে দেবে! ঠিক আছে, নেভাক। নিভিয়ে দেখাক। ছেড়ে দেয়া হবে মেয়েটাকে।'

আবার চাঁদের দিকে মুখ তুললাম। নিঃশ্বাস ফেললাম স্বস্তির। ভুল নেই পঞ্জিকায়, যদিও সময়ের হিসেব একটু হেরফের করে ফেলেছে গুড। গোল হলুদ চাঁদের একধারে একটা লালচে ছায়া দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই চাঁদের ওইধারের উজ্জ্বলতা কমে গেছে, হালকা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে যেন।

একটা হাত তুলে ধরলাম আকাশের দিকে। আমার সঙ্গে হাত তুলল গুড আর স্যার হেনরি।

'অবিশ্বাসীরা, শোন,' চেঁচিয়ে বললাম, 'শোন আমাদের মন্ত্র। এখুনি কালো হয়ে

যাবে চাঁদ।' ধীরে, ভরাট গলায় চেঁচিয়ে ইংরেজিতে বললাম, 'হাম্পটি...ডাম্পটি!'

ছায়ায় অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। কমে গেল আলো। একটা ভীত গুনগুনানি ছড়িয়ে পড়ল বিশ হাজার লোকের কণ্ঠে। সব ক'টা চোখ আকাশের দিকে।

'হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, কার্টিস,' চেঁচিয়ে ডাকলাম। 'আসুন, আমার আরও কাছে আসুন। ও গুড, তুমিও এস। তোমরাও মন্ত্র পড়।'

সেক্সপিয়ারের লেখা থেকে কয়েকটা লাইন সুর করে বলতে লাগলেন স্যার হেনরি। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে চড়া গলায় গান ধরল গুড, 'রুল ব্রিটানিয়া...'

আমাদের জাদুতে কাজ হচ্ছে। দ্রুত কমে যাচ্ছে আলো, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চাঁদ। আতঙ্কের আর্ত গোঙানি বেরিয়ে এল দর্শকদের গলা চিরে। হাঁটু গেড়ে জোড়হাতে বসে পড়েছে অনেকেই।

'দেখলে, টুয়ালা?' ডেকে বললাম। 'গাগুল, কি দেখছ? যোদ্ধারা, তোমরাও দেখ সাদা মানুষের ক্ষমতা।'

'ওটা মেঘ!' তীক্ষ্ণ গলায় চিঁ চিঁ করে উঠল গাগুল। 'এখুনি চলে যাবে!'

'যাবে না!' ধমকে উঠলাম। 'চোখের মাথা খেয়েছ নাকি পেত্নী কোথাকার? দেখছ না, কালো হয়ে যাচ্ছে চাঁদ?'

যোদ্ধাদের দিকে ফিরলাম। সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললাম, 'তোমরা চিহ্ন দেখতে চেয়েছিলে! দেখালাম। হে চাঁদ, কালো, আরও কালো হয়ে যাও!'

জমাট কালো ছায়া ঢেকে দিতে লাগল চাঁদকে। মুছে গেছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, আবছা আলোয় যোদ্ধাদের মুখগুলো চেনা যাচ্ছে না এখন। মন্ত্র পড়া চালিয়ে গেলেন স্যার হেনরি আর গুড। আতঙ্কে আর্তনাদ করছে কুকুয়ানারা, ধরে তাদের বেদম পেটানো হচ্ছে যেন।

'মারা যাচ্ছে চাঁদ!' ককিয়ে উঠল স্ক্র্যাগা। 'অন্ধকারে ডুবে যাব আমরা!' এক লাফে এগিয়ে এল সে। বর্শা তুলে সোজা মেরে বসল স্যার হেনরির বুকে। কিন্তু বিঁধল না বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা, বর্ম শার্টে বাধা খেয়ে ফিরে গেল। স্যার হেনরির শার্টের তলায় শেকলের বর্ম রয়েছে, জানে না যোদ্ধারা। ওরা মনে করল, সাদা মানুষের গায়ে বিদ্ধ হয় না বর্শা। আরও বিমূঢ় হয়ে গেল ওরা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে স্ক্র্যাগা। থাবা মেরে তার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিলেন স্যার হেনরি। নির্দ্বিধায় বসিয়ে দিলেন রাজকুমারের বুকে। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল স্ক্র্যাগা।

ব্যস, ছড়িয়ে পড়ল তীব্র আতঙ্ক। ঘুরেই দৌড় মারল যোদ্ধার দল। পড়িমরি করে গেটের দিকে ছুটল মেয়েরা। প্রহরী আর জল্লাদেরা দৌড় দিল কুঁড়ের দিকে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল টুয়ালা রাজা। কোথায় লাঠি, কোথায় কি, রাজার পেছনে পেছনে উড়ে চলল যেন বুড়ি গাগুল।

মিনিটখানেকও লাগল না, ফাঁকা হয়ে গেল বিশাল আঙিনা। আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ফুলাটা, ইনফাডুস আর ছয় সেনাপ্রধান। পায়ের কাছে পড়ে আছে স্ক্র্যাগার লাশ।

'সেনাপ্রধানরা,' বললাম আমি। 'চিহ্ন দেখিয়েছি। এবার চল। আসল জায়গায় যাই।'

এক কদম সামনে বাড়ল ইনফাডুস। ইগনোসির দিকে বর্শা নির্দেশ করে সেনাপ্রধানদের বলল, 'রাজাকে বরণ কর তোমরা।'

'আমার চোহারার দিকে তাকাও,' সেনাপ্রধানদের ডেকে বলল ইগনোসি। 'আমি ইগনোসি। ইমোটুর ছেলে। রাজরক্ত বইছে আমার শরীরে। আইন অনুযায়ী আমিই তোমাদের রাজা। বল, আমিই তোমাদের রাজা!' হাতের কুঠারটা মাথার ওপর তুলে ধরল ইগনোসি।

www.boiRboi.blogspot.com

সেনাপ্রধানরা যোদ্ধার কায়দায় বরণ করে নিল নতুন রাজাকে।

'এস,' ডাকল ইনফাডুস। ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল গেটের দিকে। তার পেছনে চলল রাজা। রাজাকে গার্ড অফ-অনার দিয়ে নিয়ে চলল ছয় সেনাপতি। আমি আর স্যার হেনরি চললাম ওদের পেছনে। সবার পেছনে ফুলাটার হাত ধরে এগোল গুড।

আমরা গেটের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকারে একেবারে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। নিকষ কালো আকাশের বুকে লাফ দিয়ে যেন উঠে এল তারার দল। মিটমিট করে তাকাল আমাদের দিকে।

কিন্তু তারার দিকে চেয়ে নষ্ট করার মত সময় এখন আমাদের নেই। একে অন্যের হাত ধরে ইনফাডুসের নেতৃত্বে এগিয়ে চললাম আমরা।

এগারো

পথঘাট সব চেনা, কাজেই অন্ধকারেও চলতে অসুবিধে হচ্ছে না ইনফাডুস আর সেনাপ্রধানদের।

এক ঘন্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। কাটতে শুরু করল গ্রহণ। চাঁদের যে ধারটা প্রথমে খাওয়া শুরু হয়েছিল, বেরিয়ে আসছে এখন। হঠাৎই সরু একফালি রূপালি চাঁদ বেরিয়ে এল, লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কালো আকাশে বিশাল একটা হারিকেন-আলোর মত মনে হচ্ছে চাঁদটাকে। অদ্ভুত, অপরূপ দৃশ্য।

কয়েক মিনিটের ভেতরই আবার হারিয়ে যেতে লাগল তারাগুলো। পথঘাট দেখতে পাচ্ছি এখন।

টুয়ালার রাজধানী লু ছাড়িয়ে চলে এসেছি আমরা। সামনে, ঘোড়ার খুরের মত দেখতে, চ্যাপ্টামাথা বিশাল এক পাহাড়। ঘাসে ছাওয়া চূড়া, ক্যাম্প ফেলার ভারি সুবিধে। এখানেই যোদ্ধাদের দেখা পেলাম আমরা। তখনও ভয় কাটেনি ওদের, মাঝেমধ্যেই আতঙ্কিত চোখ তুলে তাকাচ্ছে চাঁদের দিকে।

এগিয়ে চললাম যোদ্ধাদের মাঝ দিয়ে। চূড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়, একটা কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে ঢুকে অবাকই হলাম। আমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে বসে আছে দু'জন লোক।

'আমি পাঠিয়েছিলাম ওদেরকে,' বলল ইনফাডুস। এগিয়ে গিয়ে তুলল কি যেন। 'সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে ওরা।' ফিরে হাতের জিনিসটা দেখিয়ে বলল, 'এটাও।'

ইনফাডুসের হাতের জিনিসটা গুডের বহু আকাঙ্ক্ষিত ট্রাউজার।

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল গুড। লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে ইনফাডুসের হাত থেকে কেড়ে নিল ট্রাউজারটা। পরে ফেলতে লাগল।

'মালিক, সুন্দর পা দু'খানি ঢেকে ফেলেছেন!' হতাশা ফুটল ইনফাডুসের গলায়, কিন্তু পাত্তাই দিল না গুড।

রাতটা ওই কুঁড়েতেই কাটিয়ে দিলাম আমরা।

পরদিন বেলা করে ঘুম ভাঙল। বাইরে বেরিয়ে এলাম। এক জায়গায় জড় হয়েছে বিশ হাজার যোদ্ধা। ওদেরকে আবার সেই পুরানো দিনের গল্প বলল ইগনোসি। কি করে তার বাপ ইমোটুকে খুন করেছিল টুয়ালা, কি করে ইমোটুর ছেলে আর বৌ পালিয়ে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে, কি করে বেঁচে ফিরে এসেছে ইগনোসি, সব আবার শোনাল সে।

'আসল রাজা আমি,' শেষে বলল ইগনোসি। হাতের কুঠারটা তুলে ধরল মাথার ওপরে। 'আমাকে রাজা মানতে আপত্তি আছে কারও?'

কেউ না বলল না।

'যদি জিতি, তোমরাই হবে আমার প্রথম বিশ্বস্ত সেনাদল। কথা দিচ্ছি, ন্যায়ের রাজত্ব কায়েম করব আমি। কারও ওপর কোন অবিচার অত্যাচার হবে না।'

সবাই হর্ষধ্বনি করল।

'বেশ। এখন শোন, আগামীকাল আসবে টুয়ালা। সঙ্গে আসবে তার যোদ্ধারা। লড়াই হবে। তখনি বুঝব, আমার দলে কারা কারা আছ। এখন লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হও।'

মার্চ করে ওখান থেকে সরে গেল যোদ্ধারা।

সেনাপ্রধানদের নিয়ে যুদ্ধ বৈঠকে বসলাম আমরা। দেখতে পাচ্ছি, লু থেকে দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছে টুয়ালার দূত। খবর নিয়ে যাচ্ছে তার শুভাকাঙ্ক্ষিদের কাছে, সৈন্য সাহায্য চাইতে।

চারদিক থেকেই এল যোদ্ধারা। অনুমান করলাম, পঁয়তিরিশ হাজারের কম হবে না। আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। সেনাপ্রধানদের ধারণা, সেদিন আক্রমণ আসবে না। আসবে তার পরের দিন।

ওদের অনুমান ঠিক। বিকেলের দিকে এলো টুয়ালার দূত। সঙ্গে এসেছে কয়েকজন লোকের একটা ছোট দল। একজনের হাতে একটা তালপাতা, মাথার ওপর উঁচু করে রেখেছে। তার মানে, কথা বলতে চায়।

ইগনোসি আর কয়েকজন প্রধানকে নিয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে গেলাম আমরা।

চিতার চামড়ার আলখেল্লা পরেছে দূত। সুপুরুষ। যোদ্ধা। 'স্বাগতম!' চেঁচিয়ে বলল লোকটা। এগিয়ে এল কাছে। 'শেয়ালের কাছে সিংহ এসেছে কথা বলতে।'

'বল,' কর্কশ গলায় বললাম।

'মহান একচোখা বীর টুয়ালার নির্দেশ নিয়ে এসেছি। রাজা সবাইকে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছেন, খুবই কম শাস্তির বিনিময়ে। প্রতি দশজনে মাত্র একজন লোককে মারবেন তিনি। অন্যদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে সাদা হাতি, যে রাজকুমারকে মেরেছে, আর সাদা মানুষের কালো চাকরটা, যে রাজার মুখে মুখে কথা বলেছে, এবং বিশ্বাসঘাতক ইনফাডুসকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। এদেরকে অত্যাচার করে সাংঘাতিক কষ্ট দিয়ে মারা হবে। এই হল দয়ালু রাজা টুয়ালার নির্দেশ।'

জোরে চেঁচিয়ে জবাব দিলাম, যেন আমাদের যোদ্ধারা শুনতে পায়, 'ভাগ এখান থেকে, কুত্তা কোথাকার! কানা কুত্তাটাকে গিয়ে বল, আমরা ধরা দিচ্ছি না। চাইলে, সেই এসে আমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারে। নইলে, আর দু'বার সূর্য ডোবার আগেই তার বাড়ির দরজায় পড়ে থাকবে তার লাশ। গদিতে বসবে আসল রাজা ইগনোসি, যার বাপকে খুন করেছিল টুয়ালা হারামজাদা। কি হল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জলদি ভাগ, নইলে চাবকে তাড়াব।'

হেসে উঠল লোকটা। 'আগামীকাল যেন এতখানি জোর থাকে গলায়। চাঁদকে কালো করে দিয়েছ, বাহাদুরি দেখিয়েছ খুব। কিন্তু আগামীকাল দেখব, ওই বাহাদুরি কোথায় থাকে। দয়া করে আমার সামনে এস তখন, তারার বাচ্চা। দোহাই তোমার, আমার আসেগাইয়ের সামনে এস।'

দলবল নিয়ে চলে গেল দূত। ঠিক এই সময় ডুবল সূর্য।

সে রাতে আর করার কিছুই নেই। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা। যত পারি, বিশ্রাম নিয়ে নেব।'

তখনও ভোর হয়নি। পুবের আকাশে ধূসর আভা দেখা দিয়েছে, এই সময় এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলল ইনফাডুস। জানাল, টুয়ালার যোদ্ধারা রওনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছে অনেকখানি।

কাপড় চোপড় পরে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। প্রথমে পরলাম লোহার শার্ট। তার ওপর অন্য কাপড়। গুডও তাই করল। স্যার হেনরি লোহার শার্ট গায়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দিলেন বটে, কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক পোশাক পরলেন না। কুকুয়ানা সেনাপ্রধানের সাজে সজ্জিত হলেন তিনি। এক সেট যুদ্ধের পোশাক দিয়েছে তাঁকে ইনফাডুস। ওই পোশাকের ওপর চাপালেন চিতার চামড়ার ঢোলা চেরা আলখেল্লা। মাথায় কালো উটপাখির পালক। কোমরে গুঁজলেন নিজের রিভলভার, আর কুকুয়ানা যোদ্ধার এক সেট থ্রোইং নাইফ। হাতে তুলে নিলেন বিশাল এক কুঠার, আরেক হাতে গরুর সাদা চামড়ায় মোড়া লোহার গোল বর্ম। ঠিক এই পোশাকে সেজে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল ইগনোসি। দারুণ মানিয়েছে দুজনকেই।

দ্রুত কিছু খাবার খেয়ে নিলাম আমরা। বেরিয়ে পড়লাম কুঁড়ে থেকে। আমাদের যোদ্ধারা কতদূর কি করল দেখা দরকার।

'এক জায়গায় একটা পাথরের টিলার আড়ালে পাওয়া গেল ইনফাডুসকে। তার দলবল নিয়ে লুকিয়ে আছে। সারা কুকুয়ানায় ইনফাডুসের যোদ্ধারাই সেরা, দলের নাম ধূসরবাহিনী। এরা রিজার্ভ হিসেবে থাকবে। ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে টুয়ালার সৈন্যদের অগ্রগতি দেখছে ওরা।

রাজধানী লু থেকে পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে বেরিয়ে আসছে যোদ্ধারা। মোট তিনটে সারি। একেক সারিতে এগারো থেকে বারো হাজার যোদ্ধা।

শহর থেকে বেরিয়েই দুদিকে ঘুরে গেল দু'পাশের দুটো দল। একটা মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগল ডানে, একটা বাঁয়ে। মাঝখানের দলটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

'অ,' বলল ইনফাডুস। 'ব্যাটারা একসঙ্গে তিনদিক থেকে আক্রমণ চালাবে।'

একটু পরেই বুঝলাম, ঠিকই বলেছে ইনফাডুস। পাঁচশো গজ দূরে এসে থেমে গেল মাঝের দলটা। অন্য দল দুটো জায়গামত পৌঁছার অপেক্ষা করতে লাগল।

'ইস, একটা মেশিনগান যদি পেতাম!' গুঙিয়ে উঠল গুড। 'বিশ মিনিটে সাফ করে দিতাম ব্যাটাদের!'

'নেই যখন খামোকা আফসোস করে লাভ কি?' বললেন স্যার হেনরি। 'কোয়াটার-মেইন, একটা চান্স নিয়ে দেখুন না। নেতাটাকে ফেলে দিলে কেমন হয়? না কি পারবেন না?'

অহমে ঘা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক্সপ্রেস রাইফেল তুলে নিলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে একটা পাথরের ওপর নল রেখে নিশানা করলাম। নড়াচড়া করছে টারগেট। কি যেন বলছে দলের লোকদের। অপেক্ষা করে রইলাম। কি কারণে যেন গজ দশেক সরল লোকটা। সঙ্গে রয়েছে আরেকটা লোক। স্থির হয়ে দাঁড়াল টারগেট। ট্রিগার টিপে দিলাম। মিস করলাম। মাটিতে পড়ে গেল তার সঙ্গের লোকটা, বাঁ পাশে তিন কদম দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

'দারুণ দেখিয়েছ হে, কোয়াটারমেনই, ঠাট্টা করল গুড। 'যাই হোক, নেতাটাকে ভয় দেখাতে পেরেছ।'

খেপে গেলাম। কি, সর্বসমক্ষে অপমান! দ্রুত আবার নিশানা করে দিলাম টিপে ট্রিগার। দু'হাত ঝটকা মেরে শূন্যে তুলে ফেলল লোকটা। পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

আনন্দে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আমাদের যোদ্ধারা। পরপর দু'জন লোক এভাবে যাওয়ায় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল টুয়ালার লোকেরা, পিছিয়ে গেল খানিকটা।

গুলি করলেন স্যার হেনরি। গুড গুলি করল। আমিও করে গেলাম একটানা। পড়ে গেল আরও আটদশজন লোক। দ্রুত পিছিয়ে গেল অন্যেরা, রেঞ্জের বাইরে চলে গেল।

আমাদের রাইফেলের আওয়াজ থামার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল ডান আর বাঁ পাশ থেকে। হাজার হাজার মানুষের সম্মিলিত চিৎকারে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

দু'পাশ থেকে আক্রমণ করে বসেছে টুয়ালার লোকেরা।

আরও পিছিয়ে যাচ্ছিল সামনের দলটা, ইঙ্গিত পেয়েই থেমে গেল। এগিয়ে আসতে লাগল আবার, ধীর পায়ে তালে তালে মার্চ করে। গান ধরল ভারি গলায়। গাইতে গাইতে আরও এগিয়ে এল। রেঞ্জের ভেতর আসতেই গুলি চালালাম। পড়ে গেল কয়েকজন। কিন্তু থামল না দলটা। তবে থেমে গেল গান।

আবার শোনা গেল সম্মিলিত চিৎকার। আমাদের যোদ্ধারা। ডান থেকে বাঁয়ে লম্বা সারি দিয়ে পাহাড়ের ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে প্রথম দলটা। দ্বিতীয় দলটা রয়েছে পঞ্চাশ গজ পেছনে। তৃতীয় দলটা আরও পেছনে, চূড়ার কাছাকাছি।

চেঁচিয়ে উঠল, টুয়ালার লোকেরা, 'টুয়ালা! জিন্দাবাদ! টুয়ালা! জিন্দাবাদ!'

'ইগনোসি! জিন্দাবাদ! ইগনোসি! জিন্দাবাদ!' জবাব দিল আমাদের লোকেরা।

এগিয়ে গেল দুই দল। শুরু হল যুদ্ধ। উড়ে এল এক ঝাঁক থ্রোয়িং নাইফ। ছুটে গেল জবাব। আহতদের আর্তনাদে ভরে গেল বাতাস।

আরও কাছাকাছি হল দুটো দল। উঠল অস্ত্রের ঝনঝনা। অনেক লোক টুয়ালার দলে। স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল আমাদের প্রথম দলটা। দ্বিতীয় সারি ভেদ করতে একটু সময় লাগল। এগিয়ে এল ওরা। আক্রান্ত হলো তৃতীয় দল।

জোর বাধা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে টুয়ালার এই দলটা। আমাদের লোকেরা মেরেছে, তবে মেরেছেও অনেক।

আমাদের তৃতীয় দলটা অনেক বড়, অনেক জোরাল। ওদেরকে পরাস্ত করা সহজ হচ্ছে না। আসেগাইয়ের সামনে বুক পেতে দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে মেতেছে। বুক দিয়ে ঠেকাতে চাইছে শত্রুদের।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এই দৃশ্য দেখলেন স্যার হেনরি। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। রাইফেল ফেলে দিয়ে হাতে তুলে নিলেন কুঠার আর ঢাল। ছুটে গেলেন শত্রুদের মাঝে। তাঁর পেছনে ছুটে গেল গুড। আমি রয়ে গেলাম আগের জায়গায়।

তারার মানুষদের পাশে পেয়ে সাহস বেড়ে গেল আমাদের যোদ্ধাদের। দ্বিগুণ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা টুয়ালাবাহিনীর ওপর। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছিয়ে যেতে লাগল শত্রুদল। ঠিক এই সময় খবর এল, বাঁ পাশের টুয়ালাবাহিনী টিকতে না পেরে পিছিয়ে গেছে।

খুশিমনে মাথা দোলালাম। ধরেই নিলাম, জিতে গেছি আমরা। ঠিক এই সময় চমকে উঠলাম প্রচণ্ড চিৎকারে। ডানে মাথা ঘুরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে উঠে এসেছে ডানের টুয়ালাবাহিনী। হাজার হাজার যোদ্ধা গিজগিজ করছে সমতল চূড়ার প্রান্তে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইগনোসি। চেঁচিয়ে আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে বসে থাকা ধূসর বাহিনী। গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুদের ওপর।

ছুটে গেল ইগনোসি। আর না গিয়ে পারলাম না। ওর পেছনে পেছনে রইলাম। আসলে ওর বিরাট শরীরের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইছি নিজেকে।

ভয়ানক যোদ্ধা ইগনোসি। আমার আশপাশে লাশ পড়েছে, আর কাটা হাত পা মাথার যেন বৃষ্টি হচ্ছে। আহতদের আর্তনাদে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। আর বিশ কি পঁচিশ বছর আগে হলেই এই অবস্থা হত না আমার কিছুতেই। কিন্তু এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

লাফিয়ে এসে আমার সামনে পড়ল এক বিশালদেহী কুকুয়ানা। হাতে রক্তাক্ত আসেগাই। চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। এ সেই দূত, গতকাল যে শাসিয়েছিল। আমার বুকে বর্শার আঘাত করল সে। বিঁধল না। কিন্তু ধাক্কার চোটে উল্টে পড়ে গেলাম। উঠে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গেই। দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে লোকটা। আমাকে উঠতে দেখে আবার এগিয়ে এল। ততক্ষণে রিভলভার বের করে ফেলেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

গুলি করলাম ওর বুক লক্ষ্য করে। পড়ে গেল লোকটা।

হঠাৎ মাথায় বাড়ি লাগল ভারি কিছুর। অন্ধকার হয়ে এল চোখের সামনে। তারপর কি ঘটল বলতে পারব না।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছি। আমার ওপর ঝুঁকে আছে গুড। 'কেমন লাগছে?'

উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিলাম। 'ভাল।'

'আরেকটু হলেই তো গিয়েছিলে!'

'মাথায় বাড়ি লেগেছিল। লড়াইয়ের অবস্থা কি?'

'আপাতত তাড়িয়েছি। হাজার দুয়েক লোক হারাতে হয়েছে আমাদের। ওদের আরও বেশি, তিন হাজারের কম না।'

স্যার হেনরির খোঁজে চললাম। বেশি খুঁজতে হল না। ইগনোসি, ইনফাডুস আর অন্যান্য সেনাপ্রধানদের সঙ্গে পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন তিনি।

জানলাম, আমরা জিতিনি। অবরুদ্ধ হয়ে আছি। পাহাড় ঘিরে আছে টুয়ালাবাহিনী। আর আক্রমণ করবে না এখন। আমাদের খাবার আর পানি ফুরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমরা কাহিল হয়ে পড়লে আক্রমণ চালাবে। ধরে ধরে জবাই করবে ছাগলের মত।

'খুব খারাপ,' মন্তব্য করলাম।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন স্যার হেনরি। 'আরও খারাপ খবর আছে। ইনফাডুস বলছে, পানি ফুরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।'

'তিনটে পথ খোলা আছে এখন আমাদের সামনে,' আমার দিকে চেয়ে বলল ইনফাডুস। 'না খেয়ে মরতে পারি। উত্তরের খোলা পথে পালিয়ে যেতে পারি। কিংবা,' হাত তুলে টুয়ালাবাহিনীকে দেখিয়ে বলল, 'ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আপনার কি ইচ্ছে, মালিক?'

দ্রুত স্যার হেনরি, গুড আর ইগনোসির সঙ্গে আলোচনা করে নিলাম। মনস্থির করে নিয়ে ফিরলাম ইনফাডুসের দিকে। 'এখুনি আক্রমণ করব আমরা। ক্ষুধায় কাহিল হবার আগেই। দেরি করলে জখমের যন্ত্রণাও বেড়ে যাবে।'

'টুয়ালার টুঁটি টিপে ধরতে চাই আমি,' আমার কথার পরে যোগ করল ইগনোসি। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন, নতুন চাঁদের মত বেঁকে আছে পাহাড়টা! আর এই চাঁদের বাঁকা পেট থেকে ঠেলে জিবের মত বেরিয়ে আছে সবুজ মাঠ?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ালাম।

'এখন দুপুর। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নেবে যোদ্ধারা। সূর্য আরেকটু হেললেই হঠাৎ আক্রমণ চালাব আমরা। নিজের দল নিয়ে সবুজ মাঠে নেমে যাবে ইনফাডুস চাচা। ঝিমোবে তখন টুয়ালার যোদ্ধারা। প্রথম চোটেই বেশ কিছু খতম হয়ে যাবে ধূসর বাহিনীর হাতে। তারপর আক্রমণ করবে ওরাও। পিছিয়ে আসবে ইনফাডুস, ইচ্ছে করেই। পাহাড়ের পেটে ঢোকার পথটা সরু। একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে ওখানে ঢুকতে পারবে না শত্রুবাহিনী। অল্প অল্প করে আসতে হবে। আসবে এবং মার খাবে ধূসরবাহিনীর হাতে। কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি। ছ'হাজার লোক নিয়ে বেশিক্ষণ ঠেকাতে পারবে না চাচা। ঢুকবেই ওরা। চাচার সঙ্গে যাবেন সাদা হাতি, ইনকুবু। তাঁর কুঠারের ঝলকানি দেখলে ভিড়মি খাবে টুয়ালা,' বলে স্যার হেনরির দিকে চাইল ইগনোসি। আমার দিকে ফিরে বলল, 'দ্বিতীয় বাহিনী নিয়ে আমি থাকব চাচার পেছনে। সঙ্গে থাকবেন আপনি, টুয়ালাবাহিনীর ওপর।'

'ভাল প্রস্তাব, রাজা,' বলল ইনফাডুস।

'ইনফাডুস পিছিয়ে এলে টুয়ালার যোদ্ধারা কি করে পাহাড়ের পেটে ঢোকা যায়, এ

নিয়েই ব্যস্ত থাকবে,' আবার বলে গেল ইগনোসি, 'সুযোগ বুঝে এগিয়ে যাবে আমাদের তৃতীয় বাহিনী। দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে এগিয়ে যাবে। এক দল নেমে যাবে চাঁদের ডান মাথা দিয়ে, অন্যদল বাঁ মাথা দিয়ে। টুয়ালার লোকদেরকে দু'দিক থেকে চেপে ধরবে ওরা। আমার বাহিনী নিয়ে তখন ইনফাডুসের সঙ্গে যোগ দেব। ছিন্নভিন্ন করে দেব ব্যাটাদের। আর হ্যাঁ, ডানের দলটার সঙ্গে যাবেন বুগোয়ান, উজ্জ্বল চোখো। তিনি সঙ্গে থাকলে দলটা সাহস পাবে বেশি।'

ভালই পরিকল্পনা ইগনোসির। সায় দিলাম আমরা। ব্যাপারটা সেনাপ্রধানদের জানাল ইনফাডুস। যোদ্ধাদেরকে জানাতে গেল সেনাপ্রধানেরা।

দ্রুত কিছু খেয়ে নিলাম আমরা। জিরিয়ে নিলাম একটু।

ঘন্টাখানেক পরে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করেছে। আঠারো হাজার যোদ্ধা নিয়ে তৈরি হলাম আমরা। এইবার শুরু হবে আসল যুদ্ধ।

বারো

ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ইগনোসির সেনাবাহিনী। টিলাটক্করের আড়ালে নিজেদেরকে যতটা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করছে, নিচে টুয়ালার প্রহরীদের চোখে পড়তে চাইছে না।

আমাদের মহিষবাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে ইগনোসি, তার পাশে রয়েছি আমি। ইগনোসির আদেশের অপেক্ষা করছে ওরা।

সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ধূসরবাহিনী। দেখছি আর ভাবছি, আর ঘন্টাখানেক পরেই ওই লোকগুলোর বেশিরভাই পড়ে থাকবে ধুলোয়, কেউ অনড়, কেউ কাতরাবে যন্ত্রণায়।

আধ ঘন্টা অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর সামনে বাড়ার আদেশ দিল ইগনোসি।

সমতলের শেষ মাথায় পৌঁছে থামলাম। পাহাড়ের ঢালের অর্ধেক পথ ইতিমধ্যেই নেমে গেছে ধূসরবাহিনী। দ্রুত নামছে, একটা ব্যাপারে অনুমান ভুল হয়েছে আমাদের, শুয়ে বসে ঝিমোয়নি টুয়ালার বাহিনী। সতর্কই রয়েছে। দেখে ফেলেছে ধূসরবাহিনীকে। লড়াইয়ের জন্যে তৈরি ওরাও। আমাদেরে পরিকল্পনার প্রথম অংশ বাতিল হয়ে গেল।

পাহাড়ের গোড়ায় নেমে গেল ধূসরবাহিনী। ঘাসে ঢাকা জিভটা ধরে এগিয়ে চলল গিরিমুখের দিকে।

ওখানে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের একশো গজ দূরে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইনফাডুসের সাহায্যের দরকার না পড়লে আর এগোব না। রিজার্ভ রইল মহিষ।

যোদ্ধাদের মাঝে হঠাৎ দেখা গেল টুয়ালাকে। বসে থাকতে পারেনি। চলে এসেছে যুদ্ধের অবস্থা দেখতে। চেঁচিয়ে নিজের লোকদের আদেশ দিল সে।

সামনে বাড়াল টুয়ালাবাহিনী। তীব্রগতিতে ছুটে এল গিরিখুখের দিকে। কিন্তু মুখের কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণে খেয়াল করল, সবাই একবারে ঢুকতে পারবে না।

ধূসরবাহিনীর দিক থেকে আক্রমণের কোন লক্ষণই নেই। একেবারে চুপ।

দৌড়ে ছুটে এল টুয়ালা। নিজের দলকে সামনে বাড়ার আদেশ দিল। রাজার আদেশে দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা দল।

টুয়ালাবাহিনী চল্লিশ গজের ভেতরে চলে এসেছে। তবু চুপ ধূসরবাহিনী। তিন সারিতে দাঁড়িয়েছে ওরা। হঠাৎ কোন রকম জানান না দিয়েই সামনে বাড়ল সামনের সারিটা। আক্রমণ করে বসল। তাদের চিৎকারে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস।

www.boiRboi.blogspot.com

বেশিক্ষণ টিকল না টুয়ালাবাহিনী। কায়দা মত পেয়েছে এবার ওদেরকে ধূসরবাহিনী। দেখতে দেখতে শেষ করে দিল পুরো দল। তবে ধূসরদেরও কম ক্ষতি হয়নি। দুটো সরি অবশিষ্ট আছে আর, একটা শেষ। দ্বিতীয় আক্রমণের অপেক্ষায় রইল ওরা।

দেখতে পেলাম, ধূসরদের পুরোভাগে একবার এদিক একবার ওদিকে ছুটোছুটি করছেন স্যার হেনরি। সূর্যের পড়ন্ত আলো পড়েছে তাঁর সোনালি দাড়িতে। দূর থেকে দারুণ লাগছে দেখতে। ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে, যোদ্ধাদের উৎসাহ আর সাহস দিচ্ছেন তিনি।

এগিয়ে গেলাম আমরা। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাটিতে পড়ে আছে চার হাজার মানুষ। কেউ মৃত, কেউ মুমূর্ষু। রক্তে রাঙা সবুজ ঘাস। লাল রক্তে ভিজে এখন কালচে দেখাচ্ছে ধূসর মাটি।

এই সময় আক্রমণ করল টুয়ালার সাদা পালক বাহিনী। ইনফাডুসের দলের লোক কমে গেছে। কাজেই লড়াইটা একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল। হাজার হাজার মানুষ ধরাশয়ী হল। আহতের আর্তনাদে ভরে গেল শেষ বিকেল, কেঁপে উঠল পাহাড়-প্রান্তর।

আবার শেষ হল লড়াই। দেখলাম, ধূসরবাহিনীর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার হেনরি। মাথার ওপরে তুলে নাচাচ্ছেন রক্তাক্ত কুঠার। কারও সাহস থাকলে এসে লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানাচ্ছেন।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে ধূসরবাহিনী। মাত্র ছ'শো জন আর জীবিত আছে ওদের। শত্রুদের কেউ নেই। বেশিরভাগ পড়ে আছে মাটিতে, সামান্য কয়েকজন ছুটে যাচ্ছে গিরিমুখের দিকে। পালাচ্ছে।

খুশিতে চিৎকার করছে ধূসরবাহিনী। রক্তাক্ত আসেগাই আকাশের দিকে তুলে গালাগাল করছে, লড়াইয়ে আহ্বান করছে শত্রুদের।

কি যেন আদেশ দিল ইনফাডুস। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ছ'শো যোদ্ধা। আরও শ'খানেক গজ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ছোট টিলার ওপরে উঠে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি। লড়াইয়ের আহ্বান করলেন টুয়ালাবাহিনকে।

ছুটে এল টুয়ালার আরেকটা দল। বেধে গেল লড়াই। মাত্র ছশো ধূসরবাহিনীকে চোখের পলকে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে ওরা এবার।

'এখনও কি দাঁড়িয়ে থাকব আমরা, ইগনোসি?' অধৈর্য গলায় বললাম।

'না, মাকুমাজান,' জবাব দিল ইগনোসি। 'এখন যেতে হবে আমাদের। নইলে টিকবে না ধূসরেরা।'

ঠিক এই সময় পাহাড়ের ডান মাথা বেয়ে নেমে এল আমাদের আরেকটা দল। পেছন থেকে আক্রমণ করল টুয়ালাবাহিনীকে।

চেঁচিয়ে মহিষবাহিনীকে সামনে বাড়ার আদেশ দিল ইগনোসি। কুঠারটা মাথার ওপরে তুলে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল, লড়াইয়ের হাঁক। তীব্র গতিতে ছুটে গেল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম আমি। পেছনে চিৎকার করে ছুটে এল মহিষবাহিনী।

ভয়াবহ এক তাণ্ডবের মাঝে এসে পড়েছি যেন। পায়ের ভরে মাটি কাঁপছে। চারদিকে লড়াইয়ের হাঁক, আহতের আর্তনাদ, ভোঁতা আদেশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। চোখের সামনে হচ্ছে বর্শাবৃষ্টি। থেকে থেকে রক্তের ফোয়ারা ছিটকে উঠছে এদিক ওদিক।

সকালের মত বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই এখন, লড়ছি প্রাণপণে। এক সময় অবাক হয়েই নিজেকে আবিষ্কার করলাম টিলাটার পাশে, এটাতেই খানিক আগে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার হেনরি। এখনও আছেন তিনি, তবে টিলার গোড়ায়। সমানে অস্ত্র চালাচ্ছেন। এখানে কি করে পৌঁছেছি এসে, বলতে পারব না।

টিলার ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি। লড়াই চলছে। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে প্রতিটি যোদ্ধা,

মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আর এখন ওদের। অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে যোদ্ধাদের মাঝে ছুটোছুটি করছে বুড়ো ইনফাডুস। আদেশ দিচ্ছে, নির্দেশ দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে। সত্যিকারের এক জুলু সেনাপতি। শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ওর ওপর।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক লাগছে স্যার হেনরিকে দেখে। কার বর্শার খোঁচায় উড়ে গেছে কপালের বন্ধনী, মাথায় আর উটপাখির পালক শোভা পাচ্ছে না এখন। ছড়িয়ে পড়েছে সোনালি চুলের বোঝা। হাতের ঢালের সাদা চামড়া এখন লাল টকটকে, রক্তে ঢেকে আছে কুঠারের ফলা, রোদে চমকাচ্ছে না আর। সারা শরীরে রক্ত। তাঁর আঘাতের সামনে কেউ টিকতে পারছে না। মধ্যযুগীয় এক রোমান যোদ্ধা যেন।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল যোদ্ধাদের মাঝে, 'টুয়ালা! টুয়ালা!'

চেয়ে দেখলাম, জোর ধাক্কায় একপাশে ছিটকে পড়ল কয়েকজন যোদ্ধা। ওদের ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একচোখা দানব টুয়ারা। স্যার হেনরির সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁক ছাড়ল 'ইনকুবা! সাদা কুত্তা! আমার ছেলেকে মেরেছিস! তোকে আমি শেষ করে ফেলব!' বলেই একটা ছুরি ছুঁড়ে মারল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাল উঁচু করে ফেললেন স্যার হেনরি। চামড়া মোড়া লোহার বর্মে ভোঁতা শব্দ তুলে পড়ে গেল ছুরিটা।

ভয়ঙ্কর গর্জন করে সামনে লাফ দিল টুয়ালা। এসে পড়ল স্যার হেনরির সামনে। কুঠার চালাল। লাগলে দু'ভাগ হয়ে যেতেন স্যার হেনরি। কিন্তু সময়মত ঢাল তুলে আঘাত ঠেকালেন। আঘাতের প্রচণ্ডতা পুরোপুরি সামলাতে গিয়ে এক হাঁটুর ওপরে বসে পড়তে হল তাঁকে।

ব্যাপারটা আর বেশি বাড়তে পারল না। আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠল বাঁ পাশ থেকে। এসে গেছে আমাদের আরেকটা দল। এমনিতেই টিকতে পারছিল না টুয়ালাবাহিনী। এবারে সমানে কচুকাটা হতে লাগল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জয়পরাজয় নির্ধারণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট টুয়ালাবাহিনী আর প্রাণ দিতে চাইল না অযথা। পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। যে যেভাবে পারল, ছুটে গেল গিরিমুখের দিকে।

হঠাৎ একা হয়ে গেল ইগনোসির বাহিনী। মারার মত আর একজন শত্রুকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। টুয়ালাও গায়েব। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশের স্তূপ।

ধূসরবাহিনীর আর মাত্র পঁচানব্বইজন অবশিষ্ট রয়েছে। গর্বিত ওরা। মাথা উঁচু করে আছে। অহঙ্কারে ফুলে ফুলে উঠছে বুক।

হাতে একটা জখম হয়েছে ইনফাডুসের। কাপড় ছিঁড়ে দ্রুত বেঁধে নিয়ে মুখ তুলল। তাকাল তার অবশিষ্ট বাহিনীর দিকে। উদ্যত শির, গর্বে জ্বলজ্বল করছে চোখ।

'ছেলেরা,' শান্ত গলায় ডেকে বলল ইনফাডুস, 'আমাদের আজকের এই বীরত্ব গাথা হয়ে যাবে। যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে আমাদের নাতি। তাদের নাতিরা!' বলতে বলতেই স্যার হেনরির ওপর নজর পড়ল তার। এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল তাঁর বাহুতে। 'এক মহান লোক আপনি, ইনকুবু! অনেকদিন বেঁচেছি, অনেক যোদ্ধা দেখেছি। কিন্তু আপনার মত আরেকজন নজরে পড়েনি কখনও।'

এই সময় এগিয়ে চলার নির্দেশ এল নেতার কাছ থেকে। মার্চ করে রাজধানীর দিকে এগিয়ে গেল মহিষবাহিনী।

একজন লোক এলো ইগনোসির কাছ থেকে। আমাদেরকেও সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে ইগনোসি।

পা বাড়াতে গিয়েই খেয়াল হল, গুডকে দেখছি না। চমকে গেলাম! বেঁচে আছে তো! তাড়াতাড়ি তাকালাম এদিক ওদিক। ডানে শ'খানেক গজ দূরে দেখা গেল ওকে। এক কুকুয়ানা যোদ্ধার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ছুটলাম আমি আর স্যার হেনরি।

এক ল্যাঙ মেরে গুডকে ফেলে দিল কুকুয়ানা যোদ্ধা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল গুড। মাথা ঠুকে গেল পাথরে। এই সুযোগে একটা বর্শা কুড়িয়ে নিল কুকুয়ানা। দু'হাতে ধরে আঘাত হানল গুডের বুকে। একবার, দু'বার, তিনবার। থামল না। একের পর এক আঘাত করেই চলল।

আর বুঝি বাঁচাতে পারলাম না গুডকে! আরও জোরে ছুটলাম। আমার আগে আগে স্যার হেনরি।

পায়ের আওয়াজ শুনেই ঘুরে চাইল কুকুয়ানা। আমাদের দেখেই শেষ একবার আঘাত করল গুডের বুকে, পরক্ষণেই বর্শা ফেলে দিয়ে ঘুরে দিল দৌড়।

চিত হয়ে পড়ে আছে গুড। অনড়। চোখ বন্ধ। তার দু'পাশে গিয়ে বসে পড়লাম আমরা দু'জন।

আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে চোখ মেলল গুড। হাসল, মলিন হাসি। আইগ্লাসটা স্থির হল আমার দিকে। 'দারুণ শার্ট হে, কোয়াটারমেইন। শুধু এটার জন্যেই বেঁচে গেলাম।' বলেই জ্ঞান হারাল সে।

শুধু এই তিনটা শার্টের জন্যেই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি আমরা তিনজনই। নিজের অজান্তেই একটা হাত ঢুকে গেল কাপড়ের তলায়। নিজের লোহার শার্টের গায়ে হাত বোলালাম।

গুডকে পরীক্ষা করলেন স্যার হেনরি। কোথাও তেমন কোন মারাত্মক জখম নেই।

গরুর চামড়ায় তৈরি একধরনের স্ট্রেচার নিয়ে এল ইনফাডুসের লোক। গুডকে তাতে তুলে বয়ে নিয়ে চলল রাজধানীর দিকে। আমরাও চললাম সঙ্গে সঙ্গে।

শহরের বাইরে প্রধান ফটকের সামনে অপেক্ষা করছে মহিষবাহিনী, সঙ্গে ইগনোসি। তাদের পিছনে রয়েছে অন্যান্য যোদ্ধারা। একজন দূত ভেতরে পাঠিয়েছে নতুন রাজা। বলে পাঠিয়েছে, শহরের ভেতর যারা আশ্রয় নিয়েছে, অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করলে তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। সবক'টা ফটক খুলে দেবার আদেশ গেছে ফটকরক্ষীদের কাছে। বাধাদানকারী সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

কেউ বাধা দিল না। হাঁ হয়ে খুলে গেল সবক'টা ফটক। সবার আগে ঢুকল ইগনোসি। মার্চ করে তার পেছনে এগিয়ে গেল সেনাবাহিনীর একটা দল। অন্যেরা সতর্ক হয়ে রইল। গোলমাল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কোনরকম গোলমাল হল না। ইগনোসির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও শহরে ঢুকে পড়েছি। দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরাজিত যোদ্ধারা। তাদের অস্ত্র সব পায়ের কাছে নামানো। নতুন রাজা সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত তুলে স্যালুট করছে জুলু কায়দায়। পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে নিচ্ছে আবার। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না

মার্চ করে সোজা এসে টুয়ালার মাটির প্রাসাদের সামনে দাঁড়ালাম আমরা। বাড়ির আঙিনা ফাঁকা বললেই চলে। কুঁড়ের দরজার সামনে টুলে বসে আছে টুয়ালা। উন্নত শির। পরাজয়ের চিহ্নও নেই চেহারায়। পাশে টুলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তার ঢাল আর কুঠার। পায়ের কাছে বসে আছে গাগুল।

একে একে আমাদের সবার ওপর ঘুরে গেল টুয়ালার একমাত্র চোখ। ইগনোসির ওপর গিয়ে স্থির হল। 'সেলাম, মহামান্য রাজা!' তিক্ত ব্যঙ্গ ঝরল টুয়ালার কণ্ঠে। 'তারপর? আমাকে কি করা হবে?'

'আমার বাপকে যা করেছিলে তুমি, অনেক দিন আগে,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল ইগনোসি।

'মরতে ভয় পাই না আমি। তবে আমি চাই রাজকীয় কুকুয়ানা মৃত্যু। লড়াই করতে করতে মরতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি। কার সঙ্গে লড়বে, বেছে নাও তুমিই। আমাকে বাদ

দিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও লড়ে না রাজা, জানোই।'

আরেকবার আমাদের ওপর নজর বোলাল টুয়ালার চোখটা। স্যার হেনরির ওপর গিয়ে স্থির হল। 'ইনকুবু, একটু আগে যা শুরু করেছিলাম, শেষ করার ইচ্ছে আছে? নাকি ভয় পাচ্ছ?'

'না!' কড়াগলায় বলল ইগনোসি। 'ইনকুবু লড়বেন না তোমার সঙ্গে!'

'ভয় পেলে আর লড়বে কি,' টিটকারি দিয়ে বলল টুয়ালা।

কি বলছে, বুঝিয়ে দিলাম আমি। শুনে লাল হয়ে গেল স্যার হেনরির মুখ। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমি লড়ব।'

'ফর গডস সেক,' অনুনয় করে বললাম, 'ওকাজ করবেন না। টুয়ালা এখন বেপরোয়া।'

'আমি লড়ব!' হাতের ঢালটা সোজা করে ধরে কুঠার তুলে এগিয়ে গেলেন স্যার হেনরি।

'দোহাই, ইনকুবু,' ভাই আমার, অনুনয় করল ইগনোসিও, 'যথেষ্ট লড়েছেন। আর দরকার নেই।'

'আমি লড়ব।' একগুয়ে জবাব স্যার হেনরির।

খিকখিক করে হাসল টুয়ালা। উঠে এগিয়ে এল। দাঁড়াল স্যার হেনরির সামনে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে। অস্ত যেতে বেশি দেরি নেই। লাল আলো পড়েছে দুটো বিশাল মানুষের গায়ে। তাদের বিচিত্র সাজ আরও বিচিত্র করে তুলেছে।

বাঘে মোষে লড়াই বাধল। একে অন্যকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল। কুঠার উঁচিয়ে রেখেছে দু'জনেই।

হঠাৎ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন স্যার হেনরি। কোপ মারলেন কুঠারের।

স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গেল টুয়ালা।

কোন কিছুতে বাধল না স্যার হেনরির কুঠার। ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেলেন তিনি। সুযোগটা নিল টুয়ালা। ঘুরেই গায়ের জোরে কুঠার চালাল।

ধড়াস করে উঠল আমার হৃৎপিন্ড। গেল, সব গেল!

কিন্তু না। আশ্চর্য দ্রুত গতিতে বাঁ হাত তুলে ঢালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছেন স্যার হেনরি। প্রচণ্ড জোরে এসে ঢালে আঘাত হানল কুঠার। পুরোপুরি ঠেকাতে পারলেন না। এক পাশে একটু কাত হয়ে গেল ঢাল। পিছলে নেমে এল কুঠারের ফলা। কাত হয়ে। আড়াআড়িভাবে লাগল স্যার হেনরির কাঁধে। ধারাল দিকটা রইল একপাশে। আঘাতটা তাঁর কাঁধের তেমন ক্ষতি করতে পারল না।

টান মেরে আবার কুঠার তুলে নিল টুয়ালা। স্যার হেনরি ভালমত সোজা হবার আগেই আবার আঘাত হানল। এই আঘাতও ঢালে ঠেকিয়ে দিয়ে পাল্টা আঘাত হানলেন স্যার হেনরি।

এরপর চলল, আঘাত, প্রত্যাঘাত। কেউ কাউকে লাগাতে পারছে না। কোনটা ঢালে বাধছে, কোনটা সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস কেটে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে গেছে দর্শকদের উত্তেজনা। চেঁচিয়ে সাহস দিচ্ছে সবাই স্যার হেনরিকে। টুয়ালার কোন আঘাত এলেই গুঙিয়ে উঠছে, শংকায়।

আরেকটা আঘাত ঠেকালেন স্যার হেনরি। ঢালটাকে কায়দা করে একপাশে কাত করে পিছলে বের করে দিলেন কুঠারের ফলা। ক্ষণিকের জন্যে ভারসাম্য হারাল টুয়ালা। একপাশে সামান্য একটু কাত হয়ে গেল। প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলেন স্যার হেনরি।

পুরোপুরি ঠেকাতে পারল না টুয়ালা। ঢালে আঘাত হেনে পিছলে নিচে নেমে এল স্যার হেনরির কুঠার। ফলার একটা কোণা জোরে লাগল টুয়ালার কাঁধে। লোহার শার্টের জন্যে কাটল না তার কাঁধের চামড়া, তবে ব্যথা পেল খুব। রাগে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে পাল্টা আঘাত হানল সে। কোপ লাগল স্যার হেনরির কুঠারের হাতলে। কেটে দু'টুকরো

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে গেল হাতল। শঙ্কিত সম্মিলিত গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে।

হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে এগিয়ে গেল টুয়ালা। চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আবার খুলেই দেখলাম, ধুলায় লুটাচ্ছে স্যার হেনরির ঢাল। দু'হাতে পেছন থেকে টুয়ালার কোমর জড়িয়ে ধরেছেন তিনি।

বার বার ঝটকা দিয়ে ঘোরার চেষ্টা করছে টুয়ালা, পারছে না। এক সময় ঘুরিয়ে টুয়ালাকে মাটিতে ফেলে দিলেন স্যার হেনরি। দু'জনেই গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। একবার এ ওপরে, একবার ও। কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না।

ছুরি বেরিয়ে এসেছে স্যার হেনরির হাতে। কিন্তু সুযোগ পেলেও টুয়ালার বুকে বসাতে পারছেন না, ফিরিয়ে দিচ্ছে লোহার শার্ট। টুয়ালাও কুঠারের কোপ বসানোর সুযোগ পাচ্ছে না।

গড়াতে গড়াতেই এক সময় একে অন্যের কাছ থেকে সরে গেল। আগে উঠলেন স্যার হেনরি।

'কুড়ালটা কেড়ে নিন!' চেঁচিয়ে উঠল এক দর্শক।

কথাটা মনে ধরল স্যার হেনরির। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিলেন তিনি। টুয়ালা সোজা হওয়ার আগেই তার কুঠারের হাতল চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান লাগালেন। কিন্তু মোষের চামড়ার ফালি দিয়ে শক্ত করে টুয়ালার কব্জিতে বাঁধা আছে কুঠার। ছিঁড়ল না চামড়ার ফালি। টানের চোটে হুমড়ি খেয়ে এসে স্যার হেনরির ওপর পড়ল টুয়ালা। ধাক্কা মেরে তাঁকে ফেলে দিতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেল।

কুঠার ছাড়লেন না স্যার হেনরি। আবার দু'জনে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে। টানাটানিতে এক সময় ছিঁড়ে গেল চামড়ার ফালি। দানবীয় শক্তিতে নিজেকে টুয়ালার আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে আনলেন স্যার হেনরি। কুঠারটা এখন তাঁর হাতে। উঠে দাঁড়ালেন। গালের কাটা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে-সেদিকে খেয়াল নেই।

উঠে পড়েছে টুয়ালাও। একটানে কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল স্যার হেনরির দিকে। ছুরিটা বসাতে গেল তাঁর বুকে।

লোহার শার্ট না থাকলে হাতল পর্যন্ত ঢুকে যেত ছুরি।

পশুর মত চেঁচিয়ে উঠে আবার ছুরি চালাল টুয়ালা। কিন্তু এবারেও ফিরিয়ে দিল স্যার হেনরির লোহার শার্ট। আঘাতের প্রচণ্ডতায় ধাক্কা খেয়ে এক পা পিছিয়ে যেতে হল তাঁকে।

কব্জিতে ব্যথা পেয়েছে টুয়ালা। কিন্তু ছুরি ছাড়ল না হাত থেকে। বাগিয়ে ধরে আবার আঘাত হানতে এগিয়ে এল সে। এবার লক্ষ্য স্যার হেনরির গলা।

একটু সুস্থির হয়েছেন স্যার হেনরি। টুয়ালার গলায় লক্ষ্য স্থির করলেন তিনিও। টুয়ালা ছুরি চালাতে কাছে আসতেই কুঠার চালালেন, একপাশ থেকে গলায়।

দর্শকদের চিৎকারে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস।

লাফ দিয়ে টুয়ালার কাঁধ থেকে উঠে এল যেন মুণ্ডুটা, গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। উঁচুনিচুতে ঠোকর খেয়ে গড়াতে গড়াতে এসে থামল ইগনোসির পায়ের কাছে। কাটা গলা থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত। ঝাড়া এক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে রইল মুণ্ডুশূন্য ধড়। তারপর ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। কাটা গলা থেকে খুলে একপাশে ছিটকে পড়ল সোনার বালাটা।

সারাদিন প্রচণ্ড ধকল গেছে। তার ওপর টুয়ালার সঙ্গে সাংঘাতিক লড়াইয়ে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছেন স্যার হেনরি। কাটাছেঁড়া অসংখ্য ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণও হয়েছে প্রচুর। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। পড়ে গেলেন তিনিও, টুয়ালার ধড়ের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল লোকজন। পাখা আর পানি নিয়ে আসা হল। চোখেমুখে পানির ছিটে পড়তে লাগল। বাতাস করতে লাগল কেউ। মিনিটখানেক পরেই চোখ

মেললেন স্যার হেনরি। না, মারা যাননি তিনি, জ্ঞান হারিয়েছিলেন শুধু।

সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে এখন শুধু লালের ছড়াছড়ি। আর খানিক পরেই নামবে অন্ধকার। এগিয়ে গেলাম। ধুলায় লুটিয়ে আছে এককালের গর্বিত, মহাক্ষমতাশালী রাজার খণ্ডিত শির। কপালে বাঁধা চামড়ার বেল্টে এখনও তেমনি আটকে আছে হীরাটা, তেমনি জ্বলজ্বল করছে।

বেল্টসহ হীরাটা কাটা মুণ্ডু থেকে খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম ইগনোসির দিকে। 'এই নাও। এখন থেকে কুকুয়ানার রাজা হলে তুমি। তবে সাবধান, অন্যায় থেকে দূরে থাকবে। নইলে, ওই টুয়ালার মতই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন।'

আমার হাত থেকে বেল্টটা নিয়ে কপালে বাঁধল ইগনোসি। জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অত্যাচারীর পতন হয়েছে। আর কোন ভয় নেই তোমাদের।'

লালিমাও মুছে গেছে পশ্চিম দিগন্ত থেকে। আবছা আঁধার নেমেছে লু শহরের ওপর। সম্মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠলঃ ইগনোসি! জিন্দাবাদ! নতুন রাজা! জিন্দাবাদ!

আমার কথাই ফলল শেষ পর্যন্ত। দূতকে বলেছিলাম, আর দু'বার সূর্যোদয় দেখতে পাবে না টুয়ালা। পেল না ঠিকই। তারই মাটির প্রাসাদের সামনে ধুলায় পড়ে রইল তার খণ্ডিত লাশ

তেরো

কুঁড়েতে বয়ে নিয়ে আসা হল স্যার হেনরি আর গুডকে। জখম থেকে রক্তক্ষরণে দুজনেই দুর্বল। আমার অবস্থাও ভাল না। কাহিল তো লাগছেই, তার ওপর মাথার ব্যথা, সকালে যেখানটায় আঘাত লেগেছিল।

আমাদের সেবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে ফুলাটাকে। বুনো লতাপাতা ছেঁচে রস করে নিয়ে এল সে। আহত জায়গাগুলোতে মাখিয়ে দিল। একটু আরাম লাগল।

বড় ক্ষতগুলোতে ভাল করে অ্যান্টিসেপটিক মলম মাখিয়ে দিল গুড। বাক্সে কয়েকটা পরিষ্কার রুমাল আছে। ওগুলো ছিঁড়েই ব্যাণ্ডেজ বাঁধল।

মাংসের ঘন সুপ করে আনল ফুলাটা। দ্রুত খানিকটা করে সে ঘন তরল গিলে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। প্রিয়জনহারা মানুষের কান্না আর আমার আহত শরীরের ব্যথায় ভাল ঘুম হল না।

সকালে আমাদের দেখতে এল ইগনোসি। পালকের রাজকীয় মুকুট এখন শোভা পাচ্ছে তার মাথায়। একজন বডিগার্ড নিয়ে কুঁড়ের ভেতর ঢুকল। উঠে বসলাম কোনমতে। হেসে বললাম, 'স্বাগতম, মহামান্য রাজা।'

'খামোকা লজ্জা দিচ্ছেন, মাকুমাজান। আপনাদের কাছে আমি রাজা নই, ছোট ভাই। আপনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে রাজা হতে পারতাম না কোনদিন।'

'তারপর?' কথা ঘুরিয়ে দিলাম। 'রাজ্যের খবর কি?'

খবর জানাল ইগনোসি। সব ভালই চলছে। আশা করছে, আর সপ্তাহ দুয়েক পরেই বিরাট ভোজের আয়োজন করতে পারবে। সর্বসমক্ষে অভিষেক অনুষ্ঠান হবে।

গাগুলের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

'মৃত্যুদণ্ড দেব,' জবাব দিল ইগনোসি। 'গাগুলের বয়েস কত কেউ জানে না। কখন বুড়ি হয়েছে সে, এটাই জানে না কেউ। সব শয়তানীর মূলে ওই ডাইনীটা। ডাইনী শিকারের শিক্ষা দেয় সে-ই। ডাইনী শিকারি বুড়িগুলোকেও খতম করে দেব। ওগুলো দেশের অভিশাপ।'

'নিশ্চয় জানেশোনেও অনেক বেশি গাগুল,' মন্তব্য করলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ, চিন্তিত দেখাচ্ছে ইগনোসিকে। 'উজ্জ্বল পাথরের সন্ধানও জানা আছে তার। পাথরের কথা আমি ভুলিনি, মাকুমাজান। ভাবছি, গাগুলকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখব কিনা। আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

কিন্তু আমাদের শরীরের যা অবস্থা, এখুনি আরেক অভিযানে রওনা দেবার কথা ভাবতেও পারছি না।

আরও খানিকক্ষণ এটা ওটা আলোচনার পর বিদায় নিয়ে চলে গেল ইগনোসি।

গুডের জ্বর হয়েছে। পরের চার-পাঁচদিন অবস্থার অবনতি ঘটল আরও। আমি নিশ্চিত, মারা যাচ্ছে গুড। স্যার হেনরিও আমার সঙ্গে একমত। মন খুবই খারাপ হয়ে গেছে আমাদের।

ফুলাটার ধারণা অন্যরকম। তার বিশ্বাস, কিছুতেই মরতে পারে না বুগুয়ানা। দিনরাত অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছে গুডের।

ফুলাটার কথা সত্যি প্রমাণিত করার জন্যেই যেন বেঁচে গেল গুড। পঞ্চম রাতে জ্বর ছেড়ে গেল। সে রাতে মরার মত ঘুমাল সে। সারাটা রাত তার পাশে জেগে বসে রইল ফুলাটা।

আঠারো ঘন্টা একটানা ঘুমাল গুড! জেগে উঠেই জানাল, খিদে পেয়েছে। খেলও রাক্ষসের মত। বুঝলাম, বিপদ কেটে গেছে। হাসি ফুটল ফুলাটার মুখে।

এর দিন কয়েক পরেই অভিষেক অনুষ্ঠান হল ইগনোসির। রাজ্যের সব লোক হাজির হল অনুষ্ঠানে।

সেদিনই বিকেলে ইগনোসির সঙ্গে দেখা করে জানালাম, এবার বেরোতে চাই। সলোমনের পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখতে চাই। সত্যিই কোন খনি আছে কিনা, গুপ্তধন আছে কিনা, আবিষ্কার করতে চাই।

'মাকুমাজান,' বলল ইগনোসি, 'আমার আপত্তি নেই। এই ক'দিনে আরও অনেক কথা জেনেছি আমি। "তিন ডাইনী" নামে একটা পর্বত আছে। একটা বিশাল গুহা আছে ওই পর্বতে। ওটা এদেশের রাজরাজড়াদের কবর। গুহার কাছাকাছি একটা গভীর খনি আছে। খনির আশপাশেই কোথাও আছে একটা গুপ্তকক্ষ। ওই কক্ষের সন্ধান এখন গাগুল ছাড়া আর কেউ জানে না। শোনা যায় অনেক অনেকদিন আগে পর্বত পেরিয়ে এসেছিল এক সাদা মানুষ। এদেশেরই এক মেয়েমানুষ পথ দেখিয়ে ওই কক্ষে নিয়ে যায় তাকে। লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন দেখায়। কিন্তু ওই গুপ্তধন বের করে নিয়ে আসার আগেই বেইমানি করে মেয়েমানুষটা। দেশের রাজাকে জানিয়ে দেয় সব কথা। সাদা মানুষটাকে পর্বতের ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে আসে রাজা।'

'কাহিনীটা সত্যি, ইগনোসি। সাদা মানুষটাকে তুমিও দেখেছ, পর্বতের গুহায়।'

'হ্যাঁ, মাকুমাজান, ঠিকই বলেছেন। ওই লোকই তাড়া খাওয়া সাদা মানুষ। আপনারা যদি ওই গুপ্তকক্ষ খুঁজে পান, আর সত্যিই ওখানে থাকে পাথরগুলো...'

'আছে। ওটাই তার প্রমাণ,' আঙুল তুলে ইগনোসির কপালে বাঁধা টুয়ালার হীরাটা দেখালাম। 'ওই গুপ্তকক্ষ থেকেই এসেছে পাথরটা।'

'যদি এখনও থাকে, যত খুশি নিয়ে যাবেন আপনারা। অবশ্য, যদি এই ছোট ভাইটিকে ছেড়ে যেতে মন চায় আপনাদের।'

'আগে কক্ষটা তো দেখে আসি, তারপর অন্য কথা ভাবা যাবে,' বললাম।

'যান। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে গাগুল।'

'যদি সে রাজি না হয়?'

'তাহলে মরবে,' কঠোর গলা ইগনোসির। 'আপনাদেরকে পথ দেখানোর জন্যেই এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি তাকে।' একজন লোক ডেকে গাগুলকে নিয়ে আসার হুকুম দিল সে।

কয়েক মিনিটের ভেতরই এসে হাজির হল গাগুল। দু'জন প্রহরী দু'দিক থেকে ধরে

নিয়ে এসেছে তাকে।

'তোমরা যাও,'প্রহরীদের বেরিয়ে যেতে বলল ইগনোসি।

গাগুলকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রহরীরা। ধপ করে বসে পড়ল গাগুল। ছেঁড়া কম্বলের একটা বাণ্ডিল থেকে যেন চেয়ে আছে সাপের মত ঠাণ্ডা চকচকে দুটো চোখ।

'শোন, হারামি বুড়ি,' কর্কশ গলায় বলল ইগনোসি, 'গুপ্তকক্ষটা চিনিয়ে দিতে হবে আমাদের। ওই যে, যেখানে আছে উজ্জ্বল পাথর।'

'হাঃ হাঃ!' হাসল ডাইনীটা। চিঁ চিঁ করে বলল, 'কখনও না! খালি হাতে তারার দেশে ফিরে যাবে সাদা ইবলিসগুলো।'

'তোকে বলতে বাধ্য করব আমি, ডাইনী বুড়ি।'

'পারবে না। তোমার সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেখতে পার। সত্যি কথা বেরোবে না আমার মুখ থেকে।'

'মরবি তাহলে।'

'মরব!' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল গাগুল। 'কে মারবে আমাকে? কার এতবড় বুকের পাটা!'

'আমার,' উঠে গিয়ে একটা বর্শা নিয়ে এল ইগনোসি। 'দেখ, আমার বুকের পাটা বড় কিনা।'

বর্শার মাথাটা জ্যান্ত কম্বলের বাণ্ডিলের ওপর নামিয়ে আনল ইগনোসি। গাগুলের পশমের আলখেল্লা ভেদ করে ঢুকে গেল বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা। চামড়ায় ছেদা হতেই চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি। এক লাফে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পা দিয়ে ঠেলে আবার তাকে ফেলে দিল ইগনোসি।

সাপের মত চোখজোড়া স্থির হল ইগনোসির চোখে। বুঝল গাগুল, নতুন রাজাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করা যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিয়ে যাব ওদের। কিন্তু শুধু সাদা মানুষেরাই আমার সঙ্গে কক্ষে ঢুকবে, আর কেউ নয়। কোন কুকুয়ানা ঢুকতে পারবে না ওখানে। অভিশাপ পড়বে তার ওপর।'

চোদ্দ

তিনদিন পর। সাঁঝের বেলা এসে পৌঁছুলাম তিন ডাইনীর পাদদেশে। কয়েকটা কুঁড়ে রয়েছে এক জায়গায়, খালি। রাজাদের কবর দিতে এলে ওই কুঁড়েগুলো ব্যবহার করা হয়, বানিয়ে রেখেছে কুকুয়ানারাই। ওই কুঁড়েতেই ক্যাম্প করলাম আমরা।

আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছে ইনফাডুস, ফুলাটা, কয়েকজন প্রহরী, আর অবশ্যই গাগুল। অনেক দূরের পথ। এতখানি হেঁটে আসা সম্ভব নয় গাগুলের পক্ষে। ডুলিতে করে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে।

আগামীদিনই গুপ্তকক্ষে ঢুকতে যাচ্ছি। অবশেষে সেই রহস্যময় খনির দ্বারে পৌঁছেছি আমরা। উত্তেজনায় ভাল ঘুম হল না সে-রাতে।

সকালে উঠেই রওনা হলাম।

আমাদের সামনে চওড়া এক সাদা ফিতের মত বিছিয়ে আছে সলোমনের পথ। ধীরে ধীরে উঠে গেছে ওপরের দিকে। মাইল পাঁচেক এগিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

একটানা দেড় ঘন্টা হেঁটে বিরাট এক গর্তের কাছে পৌঁছুলাম আমরা। শ'তিনেক গজ গভীর, মুখের বেড় আধ মাইলের কম হবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

সামনের গর্তটার দিকে আঙুল তুলে স্যার হেনার আর গুডকে বললাম, 'ওটাই সলোমনের খনি।'

পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। গর্তের দু'ধার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার এক হয়ে গেছে, থেমেছে গিয়ে পাহাড়ের গোড়ায়।

আবার এগিয়ে চললাম আমরা। পথের শেষে কি আছে, দেখতে হবে। দূর থেকেই চোখে পড়ছে, আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে অদ্ভুত বস্তু। আরেকটু কাছাকাছি হতেই চিনলাম জিনিসগুলো, তিনটে মূর্তি। পাথর কুঁদে তৈরি। কুকুয়ানারা এদের নাম রেখেছেঃ নির্বাক দেব।

লম্বায় বিশ ফুটের কম হবে না একেকটা। মাঝেরটা দেবীর মূর্তি। মাথায় একটা অদ্ভুত মুকুট বসানো। মুকুটের দু'দিকে দুটো শিং। অন্য দুটো মূর্তি পুরুষ দেবতার। সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মূর্তিগুলোর বিকট চেহারায়। কেন এটা করল প্রাচীন শিল্পীরা, বুঝতে পারলাম না।

আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল ইনফাডুস, বর্শা তুলে স্যালুট করল মূর্তিগুলোকে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'মালিক, এখুনি আপনারা কবরে ঢুকতে চান? না দুপুরের খাওয়াটা সেরেই যাবেন?'

গাগুল তখুনি ঢুকতে ইচ্ছুক। তাই আর দুপুরের অপেক্ষা করতে চাইলাম না। বরং খাবারগুলো সঙ্গে নিয়ে নেব। গুহায় বসেই খাওয়া যাবে।

ডুলি থেকে নামল গাগুল। একটা ঝুড়িতে কিছু বিলটং আর দু'পাত্র পানি তুলে নিল ফুলাটা। রওনা হলাম আমরা।

সামনে দেয়ালের মত খাড়া উঠে গেছে পাথরের পাহাড়। আশি-পঁচাশি ফুট উঠে ঢালু হয়েছে। তিন হাজার ফুট উঁচুতে রোদে ঝলমল করছে বরফের চূড়া।

থেমে গেল গাগুল। ফিরে চাইল। তার কুৎসিত মুখে শয়তানি হাসি ফুটেছে। 'তারপর, তারার মানুষেরা,' চিঁ চিঁ করে বলল সে, 'মহান যোদ্ধা ইনকুবু, বুগুয়ান, জ্ঞানী মাকুমাজান, তোমরা তৈরি তো? রাজার আদেশ, তোমাদেরকে উজ্জ্বল পাথরের ঘাঁটি দেখিয়ে দিতে হবে। দেব। সত্যিই যাবে তো ভেতরে?'

'আমরা তৈরি,' গম্ভীর হয়ে বললাম।

'বেশ, বেশ। মন শক্ত করে নাও। ভেতরে ঢুকে আবার ভয় পেয়ো না যেন। বেইমান ইনফাডুস, তুমিও এস।'

'না, ওখানে আমার কোন দরকার নেই,' থমথমে মুখ ইনফাডুসের। 'কিন্তু গাগুল, কথা আরেকটু ভালমত বলবে আমার মালিকদের সঙ্গে। ওঁদেরকে তোমার দায়িত্বে ছেড়ে দিলাম। যদি একটা চুলও ছেঁড়ে কারও, তোমার কারণে, তুমি যতবড় ডাইনীই হও না কেন, আমার হাত থেকে পার পাবে না। বুঝেছ?'

'নিশ্চয়, ইনফাডুস। তোমার বড় বড় কথা বুঝব না? বাচ্চাকালেই নিজের মাকে শাসিয়েছ, আমাকে শাসাবে এতে আর দোষ কি? কিন্তু আমাকে ভয় দেখিও না। গাগুল কাউকে ভয় পায় না।' নিজের পশমের পোশাকের ভেতর থেকে একটা ছোট মাটির পাত্র বের করল সে। ওতে তেল ভরা আছে। ছোট শুকনো একটা শরের কাঠি বের করে ডুবিয়ে দিল পাত্রের তেলে। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বলল, 'চেরাগ।'

'ফুলাটা, তুমি যাবে তো?' ভাঙা ভাঙা কুকুয়ানাতে জিজ্ঞেস করল গুড।

'আমার ভয় লাগছে, মালিক,' মৃদু গলায় জবাব দিল ফুলাটা।

'তাহলে থাক। ঝুড়িটা দাও,' হাত বাড়াল গুড।

'না, মালিক। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও যাব।'

'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে। তবে আগে থেকেই বলে রাখছি, বিপদ হতে পারে।'

'আর দেরি করে কি হবে? চল যাই,' বলেই পা বাড়াল গাগুল। ঢুকে পড়ল অন্ধকার

গুহায়।

ঢুকলাম আমরাও। দু'পাশে হাত বাড়িয়ে অনুমান করলাম, বেশি চওড়া নয় গুহাটা। দু'জন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। আমাদের আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে বলছে গাগুল। তার চিঁ চিঁ শুনে অনুসরণ করে চলেছি। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। হঠাৎ খসখস শব্দ উঠল, একসঙ্গে অনেক ডানার।

'বাপরে! মুখে জানি কিসে বাড়ি মারল!' হঠাৎ বলে উঠল গুড।

'বাদুড়,' বললাম। 'এগোও।'

পঞ্চাশ কদম মত এগিয়েছি। সামনে একটু হালকা মনে হল অন্ধকার। মিনিটখানেক পরেই এক অদ্ভুত জায়গায় আবিষ্কার করলাম নিজেকে। ভারি চমৎকার দৃশ্য!

প্রকাণ্ড এক কক্ষ। জানালা নেই, কিন্তু আবছা আলো আসছে উপর থেকে। হয়ত ধনুকের মত বাঁকা শ্যাফট দিয়ে ছাত থেকে বাইরের খোলা বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ওপথেই আসছে আলো। দেখেই বোঝা যায়, বিশাল ওই গুহা মানুষের তৈরি হতেই পারে না।

পুরু গুহাটার এখানে ওখানে ছোট বড় থাম। পাথরের নয়। দেখতে বরফের মত, আসলে স্ট্যালাগমাইট। কোন কোনটার গোড়া বিশ ফুট মোটা, ধীরে ধীরে সরু হয়ে একশো ফুট উঁচু ছাতে গিয়ে ঠেকেছে। ছাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা চুন মেশানো পানি পড়ে সৃষ্টি করছে ওই থাম। এখানে ওখানে পানি ঝরছে তখনও, নতুন থাম তৈরি হচ্ছে। দুই-তিন মিনিট পর পর পড়ছে একটা করে ফোঁটা। এই হারে পানি পড়ে কত শত বছর লেগেছে একেকটা থাম তৈরি হতে, ঈশ্বরই জানেন!

আরও দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গাগুলের তাড়াহুড়োর জন্যে পারলাম না। ঠিক করলাম, ফেরার পথে দেখব।

গাগুলের পিছু পিছু এগিয়ে গুহার অন্য প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। ছাত আর মেঝে অনেক কাছাকাছি হয়ে এসেছে এখানে। সামনের দেয়ালে আরেকটা চৌকোণা গুহামুখ।

'মৃত্যু দেবতার গুহায় ঢুকতে তোমরা তৈরি তো, সাদা মানুষ?' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল গাগুল। আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে।

'এগিয়ে যাও,' গলার স্বর নির্বিকার রাখার চেষ্টা করল গুড। ভয় যে পাচ্ছে, বোঝাতে চাইছে না, আসলে। আমরা কেউই চাইছি না, ফুলাটা ছাড়া। গুডের বাহু আঁকড়ে ধরে আছে সে।

অন্ধকার দ্বারপথে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে এলেন স্যার হেনরি। 'বোঝা যাচ্ছে না, কি আছে ভেতরে। সিনিয়র ফার্স্ট। কোয়ার্টারমেইন, আপনিই আগে ঢুকুন।' স্বার্থপরের মত বললেন তিনি। সরে পথ ছেড়ে দিলেন আমাকে। কি আর করব! ঢুকলাম গাগুলের পিছু পিছু।

ঠক-ঠক! ঠক-ঠক। বদ্ধ প্যাসেজে কানে বড় বেশি বাজছে পাথরের গায়ে গাগুলের লাঠির শব্দ। লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ওই শব্দ শুনে শুনেই তাকে অনুসরণ করে চলেছি আমরা। অশুভ একটা কিছুর ছোঁয়া রয়েছে যেন বাতাসে। সেটা কি, বলে ঠিক বোঝাতে পারব না।

বিশ কদম হেঁটে আরেকটা কক্ষে এসে ঢুকলাম। আবছা আলো আছে এখানেও, তবে প্রথম কক্ষটার চেয়ে কম। আকারেও ছোট এই গুহাটা। পঞ্চাশ বাই তিরিশ ফুট, উচ্চতা বিশ ফুট মত। আলো খুবই কম। ঘর জুড়ে বিরাট এক পাথরের টেবিল রয়েছে, আবছামত চোখে পড়ছে। টেবিলের এক প্রান্তে বসে আছে বিশাল এক মূর্তি। আরও সব ছোট ছোট মূর্তি বসে আছে টেবিল ঘিরে। ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে এল চোখে। আরও পরিষ্কার দেখতে পেলাম সবকিছুই। ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। ধরে ফেললেন আমাকে স্যার হেনরি।

www.boiRboi.blogspot.com

স্নায়ুর জোর মোটামুটি শক্তই আমার। আধিভৌতিক কোন কিছুতেও বিশ্বাস নেই। কিন্তু এখানে যা দেখলাম তাতে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

টেবিল ঘিরে বসে থাকা মূর্তিগুলো কি, স্যার হেনরিও যখন বুঝতে পারলেন, নিজের অজান্তেই ছেড়ে দিলেন আমাকে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

বিড়বিড় করে কি যেন বলছে গুড, হয়ত ঈশ্বরকেই ডাকছে। তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠল ফুলাটা। আতঙ্কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল গুডের গলা, তার বুকে মুখ লুকাল।

আনন্দে হি-হি করে টেনে টেনে হাসতে লাগল গাগুল।

টেবিলের এক প্রান্তে বসে আছে বিশালদেহী এক লোকের কঙ্কাল। পনেরো-ষোলো ফুটের কম উঁচু হবে না। বিরাট একটা আসেগাই ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে। আমাদের দিকেই যেন তাকিয়ে আছে শূন্য কোটরগুলো, বীভৎস হাসি হাসছে।

'এত বড় মানুষ ছিল!' বিড়বিড় করলাম আপনমনেই।

'ওগুলো কি?' টেবিল ঘিরে বসে থাকা মূর্তিগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল গুড।

'আর ওটাই বা কি?' টেবিলের মাঝখানে বসে থাকা বাদামী বস্তুটা দেখিয়ে বললেন স্যার হেনরি।

'হিঃ হিঃ হিঃ!' হাসছে গাগুল। 'মৃত্যুদেবতার শান্তি নষ্ট করতে যারা আসে, তাদের নিস্তার নেই। হিঃ হিঃ হিঃ! হাহ্ হাহ্!' স্যার হেনরির দিকে চেয়ে ডাকল। 'এস ইনকুবু, দুর্দান্ত যোদ্ধা, এস, দেখে যাও এটা কি! এস।' হাড়সর্বস্ব আঙুলে তাঁর কোটের ঝুল খামচে ধরল ডাইনীটা। টেনে নিয়ে চলল বাদামী বস্তুটার কাছে। আমরাও চললাম সঙ্গে সঙ্গে।

কাছে গিয়ে বস্তুটা ভালমত একবার দেখেই চমকে উঠলেন স্যার হেনরি। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। দ্রুত পিছিয়ে গেলেন এক পা।

আমরাও দেখলাম বস্তুটা। টেবিলের ওপর বসে আছে একটা উলঙ্গ খণ্ডিত ধড়। কোলের ওপর রাখা তার মাথাটা। ঘাড়-গলার মাংস কুঁচকে ইঞ্চিখানেক নেমে গেছে, মাঝখান থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে মেরুদণ্ডের হাড়। বিশাল দেহ, বিশাল ভুঁড়ি। টুয়ালাকে এখন আরও বীভৎস, আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

টুপটাপ! টুপ টাপ! টুয়ালার কাটা গলায় ঝরে পড়ছে পানি। ইতিমধ্যেই চুনের হালকা একটা স্তর জমে গেছে, ঢেকে ফেলেছে লাশটাকে। কালোর ওপর সাদা চুন, বাদামী দেখাচ্ছে এজন্যেই। খণ্ডিত লাশটাকে স্ট্যালাগমাইটে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এভাবেই।

চকিতে টেবিলের চারধারে বসে থাকা মূর্তিগুলোর দিকে আরেকবার চোখ বোলালাম। এবার আর বুঝতে অসুবিধে হল না। ওগুলো এখন স্ট্যালাগমাইট, কিন্তু এককালে ওরাও রাজা ছিল কুকুয়ানাদের। মৃত্যুর পর এই গুহায় এনে স্ট্যালাগমাইট বানিয়ে রক্ষিত করা হয়েছে দেহগুলো। কত হাজার বছর আগের রাজার লাশ আছে এখানে, অনুমান করে বিস্মিত হল।

কিন্তু ওটা কি? পনেরো ফুট উঁচু কঙ্কালটা কার! সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে গেলাম আবার ওটার কাছে। ভাল করে দেখলাম। বুঝে গেলাম, কি ওটা। আসল কঙ্কাল নয়, পাথরে তৈরি। দক্ষ শিল্পীর হাতের জাদুতে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মৃত্যুদেবতা। কিন্তু এই মূর্তিটা এখানে এভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন? এটা আর বাইরের তিনটে মূর্তির বয়েস এক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হুঁ, বুঝেছি। গুহার বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে ক্রুদ্ধ দেবতা। কৌতূহলী দস্যু-তস্করকে ভয় দেখিয়ে গুহায় ঢোকা প্রতিরোধের জন্যেই এ ব্যবস্থা। বাইরের তিন মূর্তিকে অবহেলা করে যদি কেউ এখান অবধি ঢুকে পড়েও, আবছা অন্ধকারে ওই বর্শাহাতে কঙ্কালকে দেখে ভিড়মি খাবে। পালাবে সঙ্গে সঙ্গে।

আমিও তো তাই করতে যাচ্ছিলাম। সলোমনের রত্নকক্ষ পাহারা দিচ্ছে আসলে মূর্তিগুলো। নীরব বীভৎসতায় আতঙ্কিত করে যুগ যুগ ধরে তাড়িয়েছে অনধিকার প্রবেশকারীকে। তারপরে কোন একদিন কোন দুঃসাহসী কুকুয়ানা এসে ঢুকে পড়েছিল এই গুহায়। ফিরে গিয়ে সব বলেছে। রাজার হয়তো শখ হয়েছে দেখার। এসে দেখেছে। জায়গাটাকে নিজের কবর হিসেবে কল্পনা করতে নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছিল তার। হয়ত এর পর থেকেই এই গুহাটা নির্বাচিত হয়ে আছে কুকুয়ানা রাজাদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে। মৃত্যুদেবতার গুহার নামকরণ সার্থক করে তুলেছে ওই রাজারা।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভয় কেটে গেল। আর এখানে দেরি করার কোন মানে নেই। আসল জায়গায় যাওয়া দরকার। গাগুল কই?

টেবিলের ওপর উঠে গেছে গাগুল। টুয়ালার কাছে গিয়ে বসেছে। অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করছে, আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। কথা বলছে যেন লাশটার সঙ্গে।

ডাকলাম, 'গাগুল, উঠে এস। যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এবার আসল জায়গায় নিয়ে চল।'

ঝুঁকে টুয়ালার কাটা মাথায় চুমু খেল ডাইনীটা। তারপর উঠে এল ওখান থেকে। হি হি করে হাসল আমার মুখের ওপর। 'মালিকেরা কি ভয় পেয়েছেন?'

অসহ্য হয়ে উঠেছে ডাইনীটার কাণ্ডকারখানা, গা জ্বলে গেল ওর হাসিতে। 'দুত্তোর, নিকুচি করেছে তোর ভয়ের! জলদি নিয়ে চল আমাদের!'

'বেশ, মালিক, ভয় না পেলেই ভাল।' টেবিল থেকে নামল গাগুল। মূর্তিটার পেছনে চলে গেল। 'এই যে, এখানেই আছে সেই ঘর। বাতি জ্বাল, মালিক। যাও, ভেতরে যাও।' তেলের পাত্রটা আমার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে।

পকেট হাতড়ে দেশলাই বার করলাম। মাত্র কয়েকটা কাঠি অবশিষ্ট আছে। একটা কাঠি জ্বেলে শুকনো শরের কাঠিতে আগুন ধরালাম। জ্বলে উঠল অদ্ভুত প্রদীপ। ম্লান আলোয় সামনের দিকে চাইলাম। কিন্তু কই? দরজা কই? নিরেট পাথরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল দৃষ্টি!

শয়তানী হাসি হাসল গাগুল। আলোয় চকচক করছে সাপের মত ঠাণ্ডা চোখজোড়া। 'দরজা ওখানেই, মালিক।'

'ফাজলেমী বন্ধ কর তোমার!' ধমকে উঠলাম কঠোর গলায়।

'না, মালিক, মস্করা করছি না। সত্যি আছে,' আঙুল তুলে আবার পাথরের দেয়ালের দিকে দেখাল সে।

আলোটা তুলে আরও দু'পা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কই দরজা! হঠাৎই দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে নিচের দিক থেকে উঠে যাচ্ছে পাথরের দেয়াল। ওপরের একটা নির্দিষ্ট খাঁজের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কি করে চালু করা হল, বুঝতে পারলাম না। কোথাও খুব সাধারণ একটা লিভার লুকানো আছে নিশ্চয়, গাগুল জানে। চেপে দিয়েছে ওই লিভার।

দেখতে দেখতে বিরাট হাঁ করে ফেলল যেন পাথরের দেয়াল, মুখগহ্বরের ভেতর কালো অন্ধকার। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছি। সত্যি ওপাশে আছে গুপ্তধনের স্তূপ? আর মিনিট দুয়েকের ভেতরেই জানতে পারব!

'ঢোক, তারার ছেলেরা,' দরজার সামনে এসে দাঁড়াল গাগুল। 'ঢুকে যাও ভেতরে। তবে বুড়ি গাগুলের কথা শুনে নাও আগে। খনি থেকে তুলে কে এখানে এনে রেখেছে উজ্জ্বল পাথরগুলো, কে-ই বা পাহারায় বসিয়েছে দেবতাদের, জানি না। তারপরে হঠাৎ করে কেনই বা আবার তারা চলে গেছে এখান থেকে, তাও জানে না কেউ। তবে এরপর অনেকেই ঢুকেছে এখানে, উজ্জ্বল পাথরগুলো নিয়ে যেতে চেয়েছে। পারেনি। অনেক বছর আগে, পর্বতের ওপার হতে এসেছিল এক সাদা মানুষ। তাকে ভালভাবেই

www.boiRboi.blogspot.com

নিয়েছিল তখনকার রাজা, মেহমান হিসেবে জায়গা দিয়েছিল। ওই যে, রাজা বসে আছে ওখানটায়,' আঙুল তুলে টেবিলের এক ধারের একটা মূর্তি দেখাল সে। 'রাজ্যেরই এক মেয়েমানুষ জানত এই গুপ্ত কক্ষের রহস্য। সাদা মানুষটাকে সে নিয়ে আসে এখানে। পাথরগুলো দেখায়। ছাগলের চামড়ার একটা ঝোলায় পাথর ভরে নেয় লোকটা। হঠাৎ একটা বড় পাথর দেখে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা।' থামল গাগুল।

'তারপর?' জানতে চাইলাম। 'কি হল ডা সিলভেস্ত্রার?'

চট করে চাইল আমার দিকে বুড়ি। 'নাম তুমি জানলে কি করে?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল সে। আমাকে জবাব দেবার সময় না দিয়েই আবার বলে চলল, 'কেউ জানে না, তার কি হয়েছে। যাই হোক, পাথরটা তুলে নিল সে। হঠাৎই কি কারণে জানি ভয় পেয়ে হাত থেকে ঝোলা ফেলে দিয়ে ছুটল। বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। পাথরটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল রাজা। ওটাই ছিল টুয়ালার কপালে, এখন ইগনোসির দখলে।'

'এরপর আর কেউ এখানে এসেছে পাথরের জন্যে?'

'না। তোমরাই এলে। এস, যাই।' বাতিটা হাতে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল গাগুল।

'বড় বেশি বাজে বকে!' বিরক্তি ঝরল গুডের গলায়। 'আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না ওই শয়তানী বুড়ি!' বলে ফুলাটার হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার ওপাশে চলে গেল সে।

আমি আর স্যার হেনরিও ঢুকলাম। ওপাশে একটা প্যাসেজ। গাগুলকে অনুসরণ করে এগোলাম।

কয়েক গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফুলাটা। জানাল, তার শরীরটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন মাথা ঘুরছে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে যে-কোন সময়। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায়। ওখানেই একটা পাথরের ওপর তাকে বসিয়ে রেখে এগিয়ে গেলাম আমরা।

পনেরো কদম এগিয়ে আরেকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। রঙ করা কাঠের দরজা। খুলে আছে হাঁ হয়ে। চৌকাঠের কাছেই মেঝেতে পড়ে আছে ছাগলের চামড়ার একটা ব্যাগ। পেট ফোলা। ভেতরে কিছু আছে।

নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিল গুড। ভারি। 'মনে হয় হীরাই আছে!' ফিসফিসিয়ে নিজেকেই যেন শোনাল সে।

'ঢোক, ভেতরে ঢোক,' অধৈর্য মনে হচ্ছে স্যার হেনরিকে। 'এই যে, বুড়িমা, দাও, বাতিটা দাও আমার হাতে।' গাগুলের হাত থেকে বাতিটা নিয়েই দরজার ওপাশে চলে গেলেন তিনি।

তাঁর পিছু পিছু আমরাও ঢুকে পড়লাম আরেক ঘরে। উত্তেজনায় ভুলেই গেলাম গুডের হাতের ব্যাগটার কথা।

পাথর খুঁড়ে তৈরি হয়েছে এই ঘরটাও। ছোট, পনেরো বাই পনেরো ফুট। একদিকে সুন্দর করে তাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে হাতির দাঁত। এত সুন্দর দাঁত আগে কখনও দেখিনি। চার-পাঁচশো দাঁত রয়েছে। শুধু ওগুলো নিয়ে যেতে পারলেই একজন মানুষের সারা জীবনে আর খাওয়া পরার কোন ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু হাতির দাঁতের দিকে তেমন নজর দিলাম না এ মুহূর্তে। চোখ আকৃষ্ট হল অন্য জিনিসে। একপাশে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো কাঠের বাক্স। লাল রঙ করা।

'ওই যে, পেয়েছি হীরা!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'জলদি বাতি আনুন!'

বাক্সের কাছে এসে দাঁড়ালাম তিনজনেই। ওপরের বাক্সটার ডালা ভাঙা, হয়ত ডা সিলভেস্ত্রার কাজ। ভাঙা ডালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। বের করে আনলাম ভরা মুঠো। না, হীরা নয়। সোনার মোহর।

'দারুণ!' মোহরগুলো আবার বাক্সে ভরে রাখতে রাখতে বললাম, হীরা না পেলেও ক্ষতি নেই। সোনার মোহর নিয়েই বাড়ি ফিরব। কম করেও দু'হাজার মোহর আছে একেকটা বাক্সে। আর বাক্স আছে আঠারোটা।'

'পাথরও আছে!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল গাগুল। 'ওই অন্ধকার কোণটায় দেখ।' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'অনেক, অনেক পাথর পাবে।'

'ওই কোণটায় দেখুন, কার্টিস,' গাগুল যেদিকটা দেখিয়েছে, সেদিকে যেতে বললাম স্যার হেনরিকে।

'সেরেছে! জলদি আসুন! দেখে যান!' একনজর দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

ছুটে গেলাম আমি আর গুড। দেয়ালের গা ঘেঁষে রাখা আছে পাথরের তৈরি বাক্সগুলো। মোট তিনটে। দুটোর ডালা বন্ধ, একটার ডালা খুলে আছে হাঁ হয়ে।

'দেখুন!' খোলা বাক্সটার ওপর আলো ধরে বললেন স্যার হেনরি।

ভোঁতা এক ধরনের জমাট রূপালী উজ্জ্বলতা বাক্সের ভেতরে। চোখে সয়ে আসতেই দেখলাম, বাক্সের চার ভাগের তিন ভাগ ভরা আকাটা হীরায়, বেশির ভাগই বড় সাইজের। নিচু হয়ে হাতে তুলে নিলাম কয়েকটা পাথর। পাথরগুলো বাক্সে ফেলে দিয়ে বললাম, 'দুনিয়ার সেরা ধনী এখন আমরা!'

'হীরার বন্যা বইয়ে দেব বাজারে,' বলল গুড।

'আগে বের করে নিয়ে যেতে হবে তো, তারপর না ভাসানো,' বললেন স্যার হেনরি।

'হি হি হি!' চমকে উঠলাম গাগুলের আচমকা কুৎসিত হাসিতে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ডাইনীটা। 'উজ্জ্বল পাথর তো পেলে। তোলো আর ছাড় বাক্সের ভেতর, আওয়াজ শোন। ওগুলো খেয়ে পেট ভর, তেষ্টা মেটাও। হি হি হি! হাঃ হাঃ!'

গাগুলের রসিকতায় হেসে ফেললাম। নিজের কানেই কেমন অবাক লাগল হাসিটা। আরও জোরে হেসে উঠলাম, আরও। হাসিটাও এখন এক রসিকতা মনে হচ্ছে। আমার পাগলামিতে হেসে ফেলল গুড। হেসে ফেললেন স্যার হেনরিও। এত হাসছি কেন আমরা জানি না, কিন্তু হাসছি। হাসছি হাজার হাজার হীরার টুকরোর সামনে দাঁড়িয়ে, হাসির মাঝেই চোখের সামনে ভাসছে পাউণ্ডের বাণ্ডিল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা!

হঠাৎই হাসি থামিয়ে দিলেন স্যার হেনরি। আমরাও থেমে গেলাম।

'অন্য বাক্সগুলোও খোল,' চিঁ চিঁ করে উঠল গাগুল পেছন থেকে। 'যত পার, তুলে নাও। যত পার হাতে নিয়ে দেখ উজ্জ্বল পাথর।'

অন্য বাক্স দুটোর ডালা খোলায় মন দিলাম আমরা। খুলেও ফেললাম। দুটো বাক্সই কানায় কানায় ভরা। চোখ ভরে উপভোগ করছি হীরার রূপ।

হঠাৎ আঁতকে উঠলাম ফুলাটার চিৎকারে, 'বুগুয়ান ...দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!'

ফিরে চেয়ে দেখি, গাগুল নেই। কোন ফাঁকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে।

ছুটলাম তিনজনেই।

'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল!' আবার শোনা গেল ফুলাটার চিৎকার।

প্যাসেজ ধরে ছুটেছি। প্রদীপের আলোয় দেখতে পাচ্ছি, ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে পাথরের দরজা। ছুটে যাবার চেষ্টা করছে গাগুল, কিন্তু আঁকড়ে ধরে রেখেছে ফুলাটা। গাগুলের হাতে একটা ছুরি। বারবার ফুলাটার শরীরে যেখানে সেখানে ছোবল হানছে ছুরির ফলা, তবু গাগুলকে ছাড়ছে না মেয়েটা।

এক সময় ঝটকা মেরে ফুলাটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল গাগুল। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝেতে। গড়িয়ে চলে গেল পাথরের পাল্লার তলায়। বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ওপাশে। কিন্তু দেরি করিয়ে দিয়েছে তাকে ফুলাটা। পারল না গাগুল। নেমে এসেছে পাল্লা। আটকে গেল ডাইনীটা। আরও নামছে পাল্লা। আতঙ্কে

www.boiRboi.blogspot.com

চেঁচিয়ে উঠল গাগুল। থামল না, চেঁচিয়েই চলল। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে অহেতুক।

তিরিশ টন পাথরের চাপে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল হাড়-মাংস। মানুষের আস্ত দেহ ভর্তা হয়ে যাওয়ার বিচ্ছিরি শব্দ উঠল।

পাগলের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কঠিন দরজার ওপর।

পনেরো

ফুলাটার দিকে নজর দিলাম আমরা। মারাত্মক আহত হয়েছে। বেশিক্ষণ বাঁচবে না।

'আহ্! বুগুয়ান, আমি মারা যাচ্ছি!' ককিয়ে উঠল মেয়েটা। 'পা টিপে টিপে এল ডাইনীটা...দেখতে পাইনি! শরীর খারাপ লাগছিল...চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম। হঠাৎ দরজা নামতে শুরু করল...আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি ওপাশে চলে গেছে গাগুল। এক লাফে গিয়ে ধরলাম ওকে। টেনে নিয়ে এলাম ভেতরে।...জোরাজুরি করতে লাগল, ছাড়া পাওয়ার জন্যে শেষে ছুরি মারল আমাকে...আমি মারা যাচ্ছি, বুগুয়ান!'

দু'একটা শব্দ ছাড়া ফুলাটার কথা কিছুই বুঝতে পারল না গুড। হতভম্ব হয়ে পড়েছে যেন গুড।

'মাকুমাজান, আছেন ওখানে?' বলল ফুলাটা। 'আমার চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি না!'

'এই যে আমি, ফুলাটা। বল।'

'মাকুমাজান, আমার কথাগুলো বলুন বুগুয়ানকে। বলবেন?'

'বল, ফুলাটা।'

'আমার মালিক বুগুয়ানকে আমি ভালবাসি। বলুন, তারার দেশে আবার দেখা হবে আমদের। যে তারায়ই থাকুন উনি, খুঁজে বের করব আমি। তখনও হয়ত আমি কালো আর বুগুয়ান সাদাই থাকবেন। কিন্তু তারার দেশে তো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। তাঁকে আমি পাবই। বলুন ওকে, ওকে ভালবাসি আমি।...বুগুয়ান, কোথায় তুমি...তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি, ছুঁতে পারছি না, বুগুয়ান...আহ্...হ্-হ্...!'

'শেষ!' মুখ তুলল গুড। দু'গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। কাঁদছে সে।

'খামোকা কাঁদাকাটি করছ, বন্ধু,' শান্ত শোনাল স্যার হেনরির গলা।

'মানে? কি বলতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ গলা গুডের।

'বলতে চাইছি, খামোকা কাঁদছ। আর বেশিক্ষণ নেই, তুমিও চলে যাবে ফুলাটার কাছে! দেখছ না, জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে আমাদের?'

এতক্ষণ ফুলাটাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আমাদের অবস্থা বোঝার অবকাশ পাইনি। স্যার হেনরির কথায় যেন লাফ দিয়ে ফিরে এলাম বাস্তবে। তিরিশ টন ভারি পাথরের দরজা সেঁটে বসে গেছে। ওটা খোলার নিয়ম জানত যে একটা ব্রেন, সেটাও এখন এই জগদ্দল পাথরের তলায় পিষে গেছে। লিভারটা খুঁজে বের করারও কোন উপায় নেই। উল্টো পাশে বন্দি হয়ে গেছি আমরা।

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ফুলাটার লাশের পাশে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমাদেরকে এভাবে বন্দি করার পরিকল্পনা প্রথম থেকেই এঁটে রেখেছিল গাগুল। ওর রসিকতায় তখন হেসেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি, মোটেই রসিকতা করেনি ডাইনীটা।

'এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু হবে না,' বললেন স্যার হেনরি। 'শিগগিরই তেল ফুরিয়ে যাবে বাতির। আসুন, দেখি, দরজা বন্ধ করে যে স্প্রিং ওটার কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।'

আবার এসে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পাল্লা আর তার আশপাশের দেয়াল

আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলাম। প্যাসেজের দু'পাশের দেয়ালেও অনেকখানি জায়গা খুঁজলাম। কিন্তু কিছু খুঁজে পেলাম না।

'হবে না।' নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম আমি। 'যদি এদিকে কিছু থাকতই, পাল্লার তলা দিয়ে বেরোনোর ঝুঁকি নিত না গাগুল।'

'এতদূর এসে,' কঠিন এক টুকরো হাসি ফুটল স্যার হেনরির ঠোঁটে, 'শেষে এই পরিণতি ঘটল আমাদের! বুঝতে পারছি, দরজার পাল্লা খুলতে পারব না। চলুন ওঘরে ফিরে যাই।'

ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই চোখে পড়ল ঝুড়িটা। ফুলাটার ঝুড়ি। খাবার আর পানি আছে। তুলে নিলাম ওটা। আবার এসে ঢুকলাম রত্নকক্ষে। আমাদের কবরে। ফুলাটার লাশটা তুলে নিয়ে এল গুড। যত্ন করে শুইয়ে দিল মোহরের বাক্সগুলোর ধারে।

আমরা তিনজনে গিয়ে বসলাম হীরার বাক্সগুলোর পাশে, তিনজনে তিনটা বাক্সে হেলান দিয়ে। খিদে পেয়েছে। খাবার বের করে নিলাম ঝুড়ি থেকে। সামান্যই খাবার। অল্প অল্প করে খেলে চার বার খেতে পারব। পানি আছে দু'পাত্র, একেকজনের ভাগে এক কোয়ার্ট মত।

'আসুন, খেয়ে নিই,' বললেন স্যার হেনরি। 'আজ তো বেঁচে থাকি। খাবার থাকতে না খেয়ে মরি কেন?'

ছোট এক টুকরো করে বিলটং খেলাম। পানি খেলাম এক ঢোক করে। তারপর বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইলাম নীরবে। বাতির আলো কমে আসছে, ফুরিয়ে এসেছে তেল।

'কোয়াটারমেইন,' জিজ্ঞেস করলেন স্যার হেনরি, 'দেখুন তো ক'টা বাজে? আপনার ঘড়ি চলছে?'

চলছে। ছ'টা বাজে। সকাল এগারোটায় ঢুকেছি গুহায়।

সময় জানিয়ে বললাম, 'ইনফাডুস ভাববে আমাদের জন্যে। আজ রাতটা অপেক্ষা করবে। সকালেই আমাদের খুঁজতে আসবে সে।'

'খুঁজে কোন লাভ হবে না,' বললেন স্যার হেনরি। 'দরজাটা দেখতেই পাবে না। জানতেও পারবে না, আছে। সলোমনের রত্নের সন্ধানে এসে অনেকেই প্রাণ দিয়েছে, আমরা তাদের সংখ্যা বাড়াব মাত্র।'

আরও কমে এসেছে বাতির আলো।

হঠাৎ একবার দপ করে জ্বলে উঠল। পুরো দৃশ্যটা ভালমত একবার ফুটে উঠল আমাদের চোখের সামনেঃ সাদা আইভরির স্তূপ, মোহরের বাক্স, পাশে পড়ে থাকা ফুলাটার লাশ, ছাগলের চামড়ার ব্যাগ। শেষ চোখে পড়ল সঙ্গীদের উদ্বিগ্ন, ফ্যাকাসে চেহারা।

বার দুই দপদপ করল আলোর শিখা। তারপরেই নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকার যেন গিলে নিল আমাদেরকে।

ভয়াবহ এক রাত। অখণ্ড ভীষণ নীরবতা। ঘুমানোর প্রশ্নই ওঠে না। বাইরের দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভয়ঙ্কর সেই রত্নকক্ষে চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

বার বার ভাবছি নিজেদের পেছনে, আশপাশে জমানো রত্নের কথা। ভাবছি, এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সন্ধান যদি দিতে পারত কেউ, সানন্দে সব রত্ন এখন দান করে দিতাম তাকে। শিগগিরই অবশ্য অন্য ভাবনা ভাবব। বের হওয়ার সন্ধান তো দূরের কথা, এক টুকরো বিলটং কিংবা এক কাপ পানির জন্যেই তখন সমস্ত রত্ন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করব না। সারা জীবনে খরচ করে শেষ করা যাবে না, এত রত্ন পড়ে রয়েছে এখন আমাদের ছোঁয়ার ভেতরে, কিন্তু কোন লাভ নেই। এখন আর ওগুলোর এক কানাকড়ি

www.boiRboi.blogspot.com

মূল্য নেই আমাদের কাছে।

এগিয়ে চলেছে ভয়াবহ রাতের দীর্ঘ সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা। খেয়ালই নেই আমাদের।

'কোয়াটারমেইন,' এক সময় কথা বললেন স্যার হেনরি। সাংঘাতিক নীরবতায় বড় বেশি কানে বাজল শব্দটা। 'ম্যাচ-বাক্সটা আছে?'

'আছে।'

'ক'টা কাঠি আছে আর?'

'আটটা,' গুনে বললাম।

'একটা জ্বালান। সময় দেখি।'

খস করে দেশলাইয়ের কাঠি ঘষার আওয়াজ উঠল। দীর্ঘক্ষণ নিখাদ অন্ধকারে থাকার পর ওই আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল আমাদের। ঘড়ি দেখলাম। ভোর পাঁচটা। বাইরের দুনিয়ায়, আমাদের মাথার অনেক ওপরে তিন ডাইনীর তুষারছাওয়া চূড়ার ওপারে নিশ্চয় ভোরের আলো ফুটছে! আহ্, আলো! ওই হীরার রূপের চেয়ে অনেক বেশি চোখ জুড়ানো।

'আসুন কিছু মুখে দিই। গায়ের শক্তি বজায় রাখা দরকার,' বললেন স্যার হেনরি।

'কি হবে শক্তি বজায় রেখে?' বলল গুড। 'যত তাড়াতাড়ি কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ততই ভাল!'

মিথ্যে বলেনি গুড, তবু কয়েক টুকরো বিলটং চিবিয়ে দু'ঢোক পানি দিয়ে গিলে ফেললাম। খাওয়া শেষ। আবার গড়িয়ে চলল সময়। আবার চুপচাপ বসে থাকা। রাতদিনের কোন প্রভেদ নেই আমাদের কাছে, কিন্তু সময় বসে থাকছে না। এগিয়েই চলেছে।

কোনরকমে পার করে দিলাম দিনটা। দ্বিতীয়বার দেশলাই জ্বালল গুড। সন্ধে সাতটা।

আবার কিছু মুখে দিয়ে নিলাম।

ভাবতে লাগলাম আবার। বাইরেও এখন অন্ধকার নেমেছে। কিন্তু ওখানে মাথার ওপরে রয়েছে তারাজ্বলা আকাশ। শরীর জুড়োচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাসে···বাতাস! থমকে গেলাম! তাই তো, এতক্ষণ কেন মনে হয়নি কথাটা! প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, 'বাতাস! এখনও তাজা রয়েছে কি করে এই বন্ধঘরে!'

'আরে তাই তো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল গুড। 'একবারও ভাবিনি কথাটা! চারদিকে পাথরের দেয়াল। ওপরেও পাথর, নিচেও। কিন্তু এয়ারটাইট তো হয়নি! তাহলে? নিশ্চয় কোন পথ আছে? এস খুঁজে দেখি।'

এই এক বিন্দু আশার আলোই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল আমাদের। উঠে পড়লাম। হাত আর পায়ের আন্দাজে খুঁজতে লাগলাম পুরো ঘরে।

এক ঘন্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। পেলাম না কিছুই। হাল ছেড়ে দিলাম। স্যার হেনরিও খোঁজা থামিয়ে দিলেন। কিন্তু গুড থামল না। খানিকক্ষণ পর ডাক শোনা গেল তার, 'একবার এস তো এদিকে!' গলার স্বরেই বোঝা গেল, কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে সে।

অন্ধকারে হাঁচড়ে পাঁচড়ে ছুটে গেলাম গুডের কাছে।

'কোয়াটারমেইন, তোমার হাতটা দাও। হ্যাঁ, রাখ তো এখানে। এই এখানে। কিছু টের পাচ্ছ?'

'বাতাস! বাতাস আসছে!'

'এবার শোন,' বলেই পা দিয়ে জায়গাটায় লাথি মারল গুড। 'বুঝতে পারছ কিছু?'

আশায় আন্দোলিত হয়ে উঠল আমাদের হৃদয়। লাথি মারতেই জায়গাটা থেকে কেমন কাঁপা আওয়াজ বেরোল।

পকেট থেকে আবার দেশলাইটা বের করলাম। তিনটা কাঠি অবশিষ্ট আছে। কাঁপা কাঁপা হাতে ধরালাম একটা। ঘরের এই চতুর্থ কোনাটায় একবারও আসিনি আমরা। আসার দরকার পড়েনি। তাই ব্যাপারটা খেয়াল করিনি আগে। পাথরের মেঝেতে একটা পাথরের ডালা বসানো রয়েছে। চৌকোনা। পিঠে একটা লোহার রিঙও আছে, ডালাটাকে টেনে তোলার জন্যে। কাত হয়ে পড়ে আছে রিঙটা, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে মরচে ধরে গেছে আঙটার সঙ্গে।

কোন কথা বলতে পারলাম না কেউই। নীরবে পকেট থেকে ছুরি বের করল গুড। সাবধানে চেঁছে পরিষ্কার করল মরচে। রিঙের নিচে ছুরির মাথা ঢোকাল কসরৎ করে। চাড় দিল ওপরের দিকে। মরচে ধরে একেবারেই শেষ হয়ে গেছে কিনা আঙটা, কে জানে। ভেঙে গেলেই গেছি। আর টেনে তোলা যাবে না ডালাটা।

না, ভাঙল না আঙটা। রিঙটা উঠল। ছুরি রেখে রিঙ চেপে ধরে টান দিল গুড। কিছুই ঘটল না।

'আমি দেখি তো,' গুডকে সরিয়ে রিঙ চেপে ধরলাম আমি। টান দিলাম, জোরে, আরও জোরে। কোন ফল হল না।

এরপরে চেষ্টা করলেন স্যার হেনরি। তিনিও তুলতে পারলেন না ডালা।

'হুঁহ্!' পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করল গুড। পাকাল। ঢুকিয়ে দিল রিঙের ভেতর। 'কোয়াটারমেইন, তুমি এক মাথা চেপে ধর, আমি অন্য মাথা ধরছি। কার্টিস, তুমি ধর রিঙটা। আমি বললেই টান মারবে।'

তিনজনে সমানে টানতে লাগলাম। টানছি তো টানছিই। শিথিল করছি না এক বিন্দু। একটু যেন নড়ে উঠল ডালা। উঠে এল। তিনজনেই চিত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

'ম্যাচ জ্বালুন, কোয়াটারমেইন,' বললেন স্যার হেনরি। 'সাবধানে জ্বালুন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিভে না যায়।'

জ্বাললাম। নিচের দিকে আলো ফেলেই হেসে উঠলাম খুশিতে। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে।

'এবার?' জানতে চাইল গুড।

'নেমে যাব। এরপর যা হয় হবে,' বললাম।

'একটু দাঁড়ান,' বললেন স্যার হেনরি। 'কিছু বিলটং আর পানি এখনও আছে। নিয়ে আসি।'

আমি ফিরে এলাম স্যার হেনরির সঙ্গে। আমার জীর্ণ মলিন কোটের সব ক'টা পকেট ভরে নিলাম হীরায়। এতদূর এসে একেবারে খালিহাতে ফিরে যেতে চাই না, অবশ্য যদি বেরোতে পারি।

'আপনারা কিছু নেবেন না?' স্যার হেনরিকে জিজ্ঞেস করলাম। 'আমার পকেটগুলো আমি ভরেছি।'

'চুলোয় যাক হীরা! জীবনে আর ও জিনিস চোখে দেখতে চাই না।'

গুড কোন জবাব দিল না। ও হয়ত ফুলাটার কাছে গিয়ে বসেছে। শেষ বিদায় জানাতে গেছে, যে মেয়েটা ভালবাসত তাকে।

'চলুন যাই,' বললেন স্যার হেনরি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে নেমে গেছেন তিনি। 'আমি আগে যাচ্ছি। পেছনে আসুন আপনারা।'

এক, দুই করে সিঁড়ির ধাপ গুনতে গুনতে নেমে চললেন স্যার হেনরি। আমরা চললাম ঠিক তার পেছনেই। পনেরো পর্যন্ত গুনে থেমে গেলেন তিনি। 'তলায় এসে গেছি। মনে হচ্ছে কোন ধরনের প্যাসেজ এটা। জলদি আসুন।'

গুড নেমে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই নামলাম আমি। অবশিষ্ট দুটো কাঠির একটা জ্বেলে দেখলাম, কোথায় এসেছি। সরু একটা সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের ডানে

www.boiRboi.blogspot.com

বাঁয়ে দু'দিকেই চলে গেছে সুড়ঙ্গ। কোনদিকে যাব? ডানে, না বাঁয়ে? সিদ্ধান্ত নেবার আগেই আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা খেলাম। ফেলে দিতে হল কাঠি। আবার অন্ধকার। কোনদিকে যাব? কোনটা সঠিক পথ?

বাতলে দিল গুড। 'বাইরে থেকে ভেতরে আসছে বাতাস। চলাচল করছে সুড়ঙ্গ দিয়ে। আমি দেখেছি কাঠির আগুন বাঁয়ে কাত হয়ে ছিল। তারমানে ডান দিক থেকে এসেছে বাতাস।'

সুতরাং ডানেই রওনা হলাম আমরা। প্রতি কদম ফেলার আগে পা দিয়ে দেখে নিচ্ছি, কি আছে সামনে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করছি দু'পাশের দেয়াল, কি আছে বোঝার চেষ্টা করতে করতে এগোচ্ছি।

মিনিট পনেরো পরেই হঠাৎ মোড় নিল সুড়ঙ্গ। এগিয়ে চললাম। কিসের এ সুড়ঙ্গ? প্রাচীন খনির যাতায়াত পথ হতে পারে। তাছাড়া এখানে এভাবে সুড়ঙ্গ কাটতে আসবে কে?

অবশেষে থামলাম আমরা। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসতে চাইছে শরীর। নিভে গেছে আশার আলো। মনে হচ্ছে, এক কবর থেকে বেরিয়ে এসে আরেক কবরে ঢুকেছি। যেখানে আমাদের কঙ্কালও খুঁজে পাবে না কেউ কোনদিন।

বিলটঙের শেষ টুকরোটা খেয়ে নিলাম। গিলে ফেললাম শেষ ঢোক পানি। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারে। অখণ্ড নীরবতা···না, অখণ্ড নয় তো! মৃদু একটা ঝিলমিল শব্দ কানে আসছে!

'ঈশ্বর!' কিসের শব্দ বুঝে ফেলেছেন স্যার হেনরি। 'পানি! পানি বয়ে যাচ্ছে!'

আবার এগোলাম আমরা। যতই এগোচ্ছি, বাড়ছে আওয়াজ। আরও খানিকটা এগিয়ে সন্দেহ রইল না, পানিই বয়ে যাচ্ছে। একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি পানির। ভেন্টিলেটরের মত গুডও বলে উঠল, 'আমি পানির গন্ধ পাচ্ছি!'

'তাড়াহুড়ো কোরো না গুড, ধীরে ধীরে এগোও,' সতর্ক করে দিলেন স্যার হেনরি। 'কাছাকাছি থাকা দরকার আমাদের।'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঝপাং করে শব্দ উঠল। সেই সঙ্গে শোনা গেল গুডের চিৎকার। পানিতে পড়ে গেছে সে।

চেঁচিয়ে জানতে চাইলাম, কি অবস্থায় আছে গুড।

ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জবাব এল, 'কোনমতে একটা পাথর ধরে ফেলেছি! ছেড়ে দিলেই ভেসে যাব। একটা কাঠি জ্বাল, তোমরা ঠিক কোথায় আছ দেখি।'

শেষ কাঠিটা জ্বাললাম। ম্লান আলোয় দেখলাম, আমাদের পায়ের সামনেই বয়ে যাচ্ছে কালো ঘোলা পানি। কয়েক কদম সামনে একটা পাথর ধরে পানিতে ঝুলে আছে গুড।

'ঝাঁপ দিচ্ছি আমি,' ডেকে বলল গুড। 'ধর আমাকে!'

ঝাঁপ দিল গুড। ঠিক এই সময় নিভে গেল কাঠি। অন্ধকারে পানিতে সাঁতারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এগিয়ে এসে ডাক দিল। তার একটা বাড়ানো হাত ধরে ফেললেন স্যার হেনরি। টেনে তুলে নিয়ে এলেন ওপরে।

'আরেকটু হলেই গেছিলাম!' হাঁপাচ্ছে গুড। 'ওরেব্বাপরে! কি সাংঘাতিক স্রোত! তলও নেই! পা দিয়ে মাটি নাগাল পাইনি!'

'পাবে কি করে? নদী তো। পাতালের নদী। পাহাড়ের বাইরে না বেরিয়ে ভেতর দিয়ে বইছে,' বললাম ওকে।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল গুড। তিনজনেই পেট ভরে পানি খেলাম আমরা। বেশ পরিষ্কার, স্বাদও ভাল।

এখানে বসে থাকলে চলবে না। উঠে পড়লাম। নদীর দিকে পেছন করে এগিয়ে চললাম আবার।

মাটির তলায় এখানে এমনিতেই ঠাণ্ডা। তার ওপর বরফশীতল পানিতে কাপড়চোপড় সব ভিজিয়ে এসেছে গুড। খুব অস্বস্তি লাগছে তার, বুঝতে পারছি।

এক সময় আরেকটা সুড়ঙ্গের ওপর এসে পড়লাম। আড়াআড়ি ক্রস করে গেছে এটা। আবার সমস্যা। ডানে যাব না বাঁয়ে?

'আমাদের জন্যে সবই এক,' বললেন স্যার হেনরি। 'চলুন ডানে যাই। কিছু না পেলে ফিরে আসব আবার।'

চলেছি তো চলেছিই। সুড়ঙ্গ আর শেষ হয় না। অসংখ্য ছোট ছোট খানাখন্দ এটাতে। কোথাও বেরিয়ে আছে চোখা পাথর। হোঁচট খেয়ে পড়ছি, টেনে তুলছে একে অন্যকে, আবার এগোচ্ছি। সবার আগে আগে চলেছে স্যার হেনরি। ধকলটা তাঁর ওপর দিয়েই বেশি যাচ্ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি, কোনরকম জানান না দিয়েই। একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তাঁর।

'দেখুন!' ফিসফিস করে বললেন স্যার হেনরি। 'সামনে আলো দেখা যাচ্ছে না? নাকি আমার মাথাই বিগড়ে গেল!'

ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ড! সামনে তাকালাম। দেখলাম ভাল করে। হ্যাঁ, অনেক দূরে অতি আবছা আলোর একটা বিন্দু যেন! আর ধীরেসুস্থে নয়। সরু সুড়ঙ্গ ধরে প্রায় ছুটতে শুরু করলাম আমরা। পাঁচ মিনিট পরে আর কোন সন্দেহ রইল না। আলোই দেখতে পাচ্ছি আমরা।

আরও মিনিটখানেক পরে টাটকা বাতাস এসে মুখে লাগল। আরও দ্রুত এগোলাম।

ক্রমেই সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। মাথা ঠেকে যাচ্ছে ছাতে। হাত পায়ের ওপর ভর দিয়ে এগোলেন স্যার হেনরি। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আরও এগোনোর পর শুয়ে পড়তে হল লম্বা হয়ে। ক্রল করে এগোলাম। হঠাৎই খেয়াল করলাম, পাথর নেই এখানে। পাথরের সুড়ঙ্গ নয়। মাটি। সুড়ঙ্গটা এখানে শেয়ালের গর্তের মত মোটা।

ঠেলাঠেলি, চাপাচাপি করে গর্তের মুখ আরেকটু বড় করে বেরিয়ে গেলেন স্যার হেনরি। এবার ওই পথে আমাদের বেরোনো তো সোজা। বেরিয়ে এলাম তারাজ্বলা আকাশের নিচে। বুক ভরে টেনে নিলাম ভোরের মিষ্টি বাতাস। আহ্, কি শান্তি! আবার ফিরে এসেছি সেই পরিচিত পৃথিবীতে।

হঠাৎ মাটি সরে গেল পায়ের তলা থেকে! আলগা হড়হড়ে মাটি। পড়ে গেলাম তিনজনেই। গড়াতে লাগলাম ঢাল বেয়ে। নরম ঘাস আর ঝোপ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না আমাদের দেহ। গড়াতে গড়াতে ভেজা নরম মাটিতে এসে ঠেকলাম। উঠে বসে চেঁচিয়ে ডাকলাম সঙ্গীদেরকে। কয়েক হাত দূর থেকে সাড়া এল। উঠে বসেছেন স্যার হেনরিও। দু'জনে মিলে খুঁজতে লাগলাম গুডকে।

কয়েক গজ ওপর দিকে একটা ছোট চারাগাছের গোড়া আঁকড়ে ধরে আছে গুড। তার ভয়, ছেড়ে দিলেই গড়িয়ে গিয়ে পড়বে কোন খাদে।

তিনজনে আবার নেমে এলাম নরম সমতল মাটিতে।

'কিন্তু মাটি সরে গেল কেন পায়ের তলা থেকে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল গুড।

'গর্তটা আসলেই শেয়ালে খুঁড়েছে,' বললাম আমি। 'খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গের একটা মুখ পর্যন্ত। সুড়ঙ্গগুলোতে নিশ্চয় এখন শেয়ালের বাসা। রাতের বেলা খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে ওরা, তাই সুড়ঙ্গ খালি ছিল। দিনে আমরা সুড়ঙ্গে নামলেই গেছিলাম। শেয়ালে ধরেই খেয়ে ফেলত। খোঁড়া মাটি গর্তের মুখেই জমিয়ে রেখেছে। ওগুলোতে পা রেখেছিলাম আমরা। ব্যস, হড়কে গিয়ে চিতপাত।'

ধূসর হয়ে এল পুবের আকাশ। কোথায় আছি, দেখতে পেলাম আবছাভাবে।

www.boiRboi.blogspot.com

সন্দেহ নিরসনের জন্যে ফিরে চাইলাম। না, কোন ভুল নেই। আবছা কালো আকাশের দিকে মাথা তুলে উদ্ধত ভঙ্গিতে বসে আছে পাথরের তিনটে বিকটদর্শন মূর্তি। গভীর খনিটার একপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি আমরা। খনির প্রায় তলায় বসে আছি এখন।

'আমার মনে হয়,' বললেন স্যার হেনরি, 'ওই সুড়ঙ্গ সবটাই মানুষের খোঁড়া। খনি থেকে হীরা তুলে নিয়ে ওই পথের রক্তকক্ষে গেছে শ্রমিকেরা। খনি বন্ধ করে দেয়ার আগে আবার বুজিয়ে দিয়েছে মাটির সুড়ঙ্গ। পরে আবার খুঁড়েছে শেয়ালে।'

ধীরে ধীরে আরও পরিষ্কার হল পুবের আকাশ, আলো ফুটছে। সঙ্গীদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি এখন। কি চেহারা হয়েছে! চোখ বসে গেছে গর্তে, চুল উস্কোখুস্কো। ওদের দিকে চেয়েই বুঝতে পারছি নিজের অবস্থা কেমন। তিনজনেরই সারা শরীর বালি আর কাদায় মাখামাখি, দেহের অসংখ্য জায়গায় চামড়া ছিলে-ছড়ে গেছে। কেটে গেছে জায়গায় জায়গায়, শুকিয়ে আছে রক্ত। কখন কাটল, কখন কি হল, উত্তেজনায় খেয়ালই করিনি।

দেরি করার কোন মানে নেই। উঠে পড়লাম। ঝোপঝাড় ধরে বিশাল খনির ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম ধীরে ধীরে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা।

উঠে এলাম খাদের ওপরে। সামনের মূর্তিগুলোর দিকে আরেকবার চেয়েই পেছন ফিরলাম। জীবনে আর ওমুখো হতে চাই না।

খাদের ধারের পথে এসে উঠলাম। নিচে শ'খানেক গজ দূরে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে আছে মানুষ। এগোলাম ওদের দিকে।

হঠাৎ একজন লোক দেখতে পেল আমাদের। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে, চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

'ইনফাডুস!' চেঁচিয়ে ডাকলাম। 'আরে আমরা! তারার সাদা মানুষ!'

ছুটে এল ইনফাডুস। চোখেমুখে ভয়। আমাদেরকে ভূত ভাবছে। বোঝালাম ওকে আমরা ভূত নই।

'মালিক, আপনারা ফিরে এলেন শেষ পর্যন্ত! মৃত্যুর গুহা থেকে ফিরে আসতে পারলেন! পারলেন!' একনাগাড়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ইনফাডুস।

যোদ্ধারা এসে ঘিরে ধরল। আমাদেরকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে নাচতে শুরু করল ওরা।

ষোলো

দু'দিন বিশ্রাম করলাম আমরা ওখানে। তারপর রওনা হলাম রাজধানী লু-এর উদ্দেশ্যে।

ফিরে এলাম রাজধানীতে। মরতে মরতে কি করে বেঁচে এসেছি, আগ্রহ নিয়ে শুনল সব ইগনোসি।

আসল কথা বললাম এরপর, 'ইগনোসি, এবার আমাদের যেতে হয়।'

আঁতকে উঠল যেন ইগনোসি। অনেক অনুরোধ করল আমাদের, তার দেশে থেকে যেতে। শেষে কেঁদেই ফেলল। আমাদেরকে কিছুতেই যেতে দিতে চায় না সে।

অনেক করে বোঝালাম তাকে। নিতান্তই অনিচ্ছায় রাজি হল শেষে। মুখ গোমড়া করে বলল, 'যান। যাবেনই তো। কালোদের সঙ্গে আপনাদের সাদা মানুষের যে অনেক তফাৎ।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসবে আমার চাচা ইনফাডুস। সঙ্গে এক রেজিমেন্ট যোদ্ধা যাবে। পর্বতের ওপারে পার করে দিয়ে আসবে। আমরা যে পথে এসেছিলাম সেপথে আর যাবার দরকার নেই। আরও একটা পথ আছে। সে পথে গেলে মরুভূমি পড়বে অনেক কম। সহজেই পেরিয়ে যেতে পারবেন।'

পরদিন ভোরে লু থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সজল চোখে আমাদের বিদায় দিল ইগনোসি। নীরবে তার আঙিনা থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের সঙ্গে চলেছে ইনফাডুস, আর মহিষবাহিনীর একটা দল। আমরা চলে যাব, আগের দিনই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে কুকুয়ানাদের মাঝে। এত ভোরেও এসে হাজির হয়েছে ওরা। পথের দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মলিন মুখে বিদায় জানাচ্ছে আমাদের। ওদের মাঝে থেকে যাবার ইচ্ছেটা জোর করে তাড়ালাম।

বেরিয়ে এলাম রাজধানী থেকে। ইনফাডুস জানাল, সুলিমান বার্গ পেরিয়ে যাবার দরকার নেই আমাদের। উল্টোদিকে আরেকটা ছোট পর্বত আছে। সহজেই পেরোনো যাবে ওটা। ওপারে মরুভূমিও নেই। সহজেই দেশে পৌঁছুতে পারব আমরা ওপথে গেলে।

চারদিনের দিন বিকেলে এক পার্বত্য উপত্যকায় এসে পৌঁছুলাম আমরা। উত্তরে মাইল পঁচিশেক দূরে দেখা যাচ্ছে সেবার স্তনের চূড়া।

পরদিন ভোরে দু'হাজার ফুট উঁচু একটা পর্বতের গোড়ায় এলাম। এখান থেকে একটা পথ চলে গেছে মরুভূমির দিকে।

এখানে বিদায় নিল ইনফাডুস। আমাদেরকে ফিরে যাবার অনেক অনুরোধ করল। শেষে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হল সে যোদ্ধাদের নিয়ে। কিন্তু সবাইকে নিয়ে গেল না। পাঁচজন লোক দিয়ে গেল আমাদের সঙ্গে, ওরা মরুভূমি পার করে দিয়ে আসবে আমাদের।

বিকেল নাগাদ পার্বত্য এলাকা ছাড়িয়ে এলাম আমরা।

সে-রাতে আগুনের পাশে বসে স্যার হেনরি বললেন, 'কুকুয়ানার চেয়ে অনেক খারাপ জায়গা আছে দুনিয়ায়। আসলে, থেকে যেতে পারতাম আমরা ওখানে।'

'কোয়াটারমেইন, চল না সকালেই ফিরে যাই,' ফস করে বলে বসল গুড। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। আমার ছেলে আছে দেশে। তাছাড়া একেবারে খালি হাতে ফিরে আসিনি। কোটের পকেট ভরে এনেছি হীরা। বাকি জীবনটা শান্তিতেই কাটিয়ে দিতে পারব। খামোকা বিদেশবিভূঁইয়ে পড়ে থেকে কি লাভ?

পরদিন সকালে মরুভূমিতে এসে পড়লাম। দুপুরের আগেই চোখে পড়ল মরুদ্যানটা। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে খেজুর গাছের সারি।

সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক আগে মরুদ্যানে এসে পড়লাম আমরা। কি সুন্দর সবুজ ঘাস! নহর বয়ে যাবার মৃদু কুলুকুলু আওয়াজ কানে আসছে। পাখি ডাকছে। এত সুন্দর মরুদ্যান আছে, জানতাম না।

নহরের পাশ দিয়ে হাঁটছি আমরা। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। চোখ রগড়ে ভালমত তাকালাম সামনের দিকে। না, ভুল তো দেখছি না। গজ পঁচিশেক দূরে একটা ডুমুর গাছের তলায় একটা কুঁড়ে। দরজাও আছে। সভ্য মানুষেরা যেভাবে দরজা বানায় তেমনি।

'ঘটনাটা কি?' সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, 'ওখানে ওই কুঁড়ে কে বানাল?'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই খুলে গেল কুঁড়ের দরজা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল একজন শ্বেতাঙ্গ। চামড়ার পোশাক পরা। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। অসম্ভব! আমাদের আগে কোন শ্বেতাঙ্গ শিকারি এদিকে এসেছে বলে শুনিনি কখনও! তাজ্জব হয়ে চেয়ে আছি লোকটার দিকে।

হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল শ্বেতাঙ্গ লোকটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এল আমাদের দিকে। কাছাকাছি এসে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল লোকটা।

ছুটে গেলেন স্যার হেনরি। লোকটার পাশে বসে মুখটা নিজের দিকে ফেরালেন। 'ঈশ্বর! এ তো জর্জ!'

www.boiRboi.blogspot.com

স্যার হেনরির গলার আওয়াজ পেয়ে আরেকটা লোক বেরিয়ে এল কুঁড়ে থেকে। ওর পরনেও চামড়ার পোশাক। শ্বেতাঙ্গ নয়। আমাদের দিকে ছুটে এল সে।

'বাস,' কাছে এসে বলল লোকটা। 'আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি জিম, বাস। শিকারি জিম।'

উঠে বসেছে জর্জ। দু'ভাই দু'ভাইকে জড়িয়ে ধরল। হাসছে পাগলের মত।

'জর্জ,' কথার ফুলঝুড়ি ছুটল স্যার হেনরির মুখে, 'তোকে খুঁজতে আমি সলোমন পর্বতের ওপারে চলে গেলাম! আর তুই পড়ে আছিস এখানে!'

'আমিও যেতে চেয়েছিলাম,' বলল জর্জ। 'কিন্তু এখানে এসেই পড়লাম বিপদে। পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল একটা পাথর। ভেঙে গেল পা-টা। অকেজো হয়ে গেলাম।'

জর্জের পাশে গিয়ে বসলাম আমি। 'কেমন আছেন, মিস্টার নেভিলি? আমাকে চিনতে পারছেন?'

'মিস্টার কোয়াটারমেইন!' বলল জর্জ। গুডের দিকে তাকাল। 'আরে, ক্যাপ্টেন গুডও এসেছেন দেখছি! স্বপ্ন দেখছি না তো? সত্যিই আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন আপনারা!'

সে রাতে আগুনের পাশে বসে তার কাহিনী আমাদের শোনাল জর্জ। বছর দুই আগে সিটাণ্ডার ক্রাল থেকে যাত্রা করে সে। তারপর মরুভূমি পেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছে। আমরা যে পথে সুলিমান বার্গে গিয়েছি, সেপথে না গিয়ে আরেকটা সোজা পথে এসে পড়ে সে। চলে আসে এই মরুদ্যানে। এখানে দিন দুই বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেত সলোমনের খনিতে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। ঝর্নাটার নিচের দিকে বসেছিল জর্জ। মধু খুঁজতে পাহাড়ের ওপরে চড়েছিল জিম। তার পা লেগে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে একটা আলগা পাথর। এসে পড়ে জর্জের পায়ে। ভেঙে যায় পা-টা। খোঁড়া পা নিয়ে সামনে সলোমনের খনিতেও যেতে পারেনি, পেছনের মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সভ্য জগতে ফেরার সাহসও হয়নি। তার দোষে জর্জের পা ভেঙেছে, তাই অসহায় লোকটাকে ফেলে চলে যেতে পারেনি জিমও। এখানে এই মরুভূমিতে খাবার বা পানির কোন অসুবিধে নেই। খেজুর আছে, আছে প্রচুর শিকার। ঝর্না তো দিনরাত বয়েই চলেছে।

জর্জের কথা শেষ হলে আমাদের অভিযানের কাহিনী শোনালেন তাকে স্যার হেনরি। অনেক রাতে শুতে গেলাম আমরা।

—o—

পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৯৭

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com